গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬১ বর্ষ ৪৪ সংখ্যা ৩ - ৯ জুলাই, ২০০৯ প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর www.ganadabi.in মূল্য ঃ ২ টাকা

কী উদ্দেশ্যে, কাদের বিরুদ্ধে লালগড়ে এই যৌথ সামরিক অভিযান

১৮ জুন থেকে টানা সামরিক অভিযান চালিয়েও লালগড় এলাকায় একজন মাওবাদীরও সন্ধান পায়নি রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের যৌথ বাহিনী। অথচ এই প্রায় অস্তিত্বহীন মাওবাদীদের ধরার নামেই তারা লালগড় এলাকার নিরীহ গ্রামবাসীদের উপর দিনের পর দিন নির্মম অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। পুলিস ও সামরিক বাহিনী যাকে সামনে পাচ্ছে নির্বিচারে লঠিপেটা করছে। শিশু-নারী-বৃদ্ধ কারুরই রেহাই নেই। বাহিনীকে দেখে মানুষ যখন আতঙ্কে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে, বুটের লাথিতে দরজা ভেঙে, কখনও মাটির বাড়ি ধূলিসাৎ করে ভীত-সন্ত্রস্ত মানুষকে বের করে এনে নির্মম ভাবে পেটানো হয়েছে, মেরে হাত-পা ভেঙে দেওয়া হয়েছে, গ্রেফতার করা হয়েছে নির্বিচারে। আতঙ্কে গ্রামের পর গ্রাম জনশূন্য হয়ে শ্মশানপুরীর মতো পড়ে রযেছে। এইভাবেই গত এক পক্ষকাল ধরে মাওবাদী সন্ত্রাস দমনের নামে এলাকায় 'শান্তি প্রতিষ্ঠার' অভিযান চালাচ্ছে যৌথবাহিনী।

সামরিক অভিযানের শুরুতে রাজ্য সরকার সংবাদ মাধ্যমের একাংশকে পাশে নিয়ে এমন একটা প্রচার তোলার চেষ্টা করেছিল, যেন পশ্চিম মেদিনীপুরের গোটা জঙ্গলমহল এলাকা মাওবাদীদের দখলে চলে গেছে। মাওবাদী নেতা নামে কিছু ব্যক্তির পিছন দিক থেকে তোলা ছবি সংবাদমাধ্যমে দেখিয়ে, টিভি চ্যানেলগুলিতে তাদের টেলিফোন ইন্টারভিউ শুনিয়ে সামরিক অভিযানের সপক্ষে অনুকূল জনমত তৈরি করতে দিনরাত প্রচার চালানো হয়েছে। ইরাকে বুশের নেতৃত্বে মার্কিন বাহিনী যেমন সাদ্দাম হোসেনের বিরুদ্ধে গণবিধবংসী অস্ত্র রাখার ধুয়া তুলে বিশ্বজনমতকে প্রভাবিত করে সেনা হামলা শুরু করেছিল, এখানে তেমনই সিপিএম-কংগ্রেস নেতৃত্ব মাওবাদীরা রয়েছে এই অজুহাত তুলে শোষিত-বঞ্চিত নিরীহ জনসাধারণের আন্দোলনকে মিলিটারি বুটের তলায় পিষে মারতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। বাস্তবে, খবরের কাগজের ছবিতে, টিভি চ্যানেলের বক্তৃতায় আর সরকারি মন্ত্রী-আমলাদের বিবৃতিতে ছাড়া মাওবাদীদের এই 'ব্যাপক উপস্থিতি' আর কোথাও নেই। যাদের বিরুদ্ধে এত সাজ সাজ রব, সমগ্র অভিযানে সেই মাওবাদীদের খুঁজে পাওয়া না গেলেও প্রতিদিন সংবাদমাধ্যমে 'ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণ', 'গুলির লড়াই', 'প্রত্যাঘাতের আশঙ্কা' প্রভৃতি নানা রোমহর্ষক সংবাদ প্রচারিত হচ্ছে। সমগ্র অভিযানে একজন মাওবাদীও মারা যায়নি, কোনও মাওবাদী গ্রেফতার হয়নি, পুলিস-মিলিটারির গায়েও কোনও আঁচড় লাগেনি। কিছু মাওবাদী যারা ঝাড়খণ্ড থেকে এসেছিল, যাদের ধরার অজুহাতেই এই অভিযান, তারা হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। বাস্তবে ল্যান্ডমাইনের নামে পাওয়া গেছে কিছু তার জড়ানো খালি টিফিন কৌটো। গুলি বিনিময়ের উত্তেজক খবর প্রকাশিত হলেও গুলি কোথা থেকে আসছে, কারা ছুঁড়ছে, মাওবাদীদের হাতে যদি 'এ কে -৪৭'-এর মতো ভয়ঙ্কর অস্ত্রই থেকে থাকে তবে তার গুলিতে একজন পুলিসও আহত হল না কেন, তার কোনও হদিশ আজ অবধি কেউ দিতে পারেনি। যেসব সাংবাদিকরা অনেক কষ্ট স্বীকার করে বন-জঙ্গলের মধ্যেও যৌথবাহিনীর এই অভিযানের সঙ্গী হয়েছিলেন, হতাশ হয়ে তাঁরাই লিখছেন, ''গত ন'দিনে যুদ্ধের কিছুই দেখা গেল না। সবটাই যেন 'যুদ্ধ-যুদ্ধ' খেলা।'' বলেছেন, ''এ ক'দিন যা হয়েছে, তা কার্যত সমরসজ্জায় সজ্জিত যৌথবাহিনীর 'রোড শো'।'' আসলে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে ঘুরে দাঁড়ানো দৃঢ়চিত্ত আদিবাসী মানুষের এই আন্দোলনকে দমন করার অজুহাত হিসাবে সিপিএম ও কংগ্রেস নেতৃত্বের তরফ থেকে দেশের মানুষকে এটা বোঝানো দরকার ছিল যে, জনসাধারণ নয়, এই আন্দোলনের পিছনে রয়েছে মাওবাদীরা। আর মাওবাদীরাও প্রচারের আলোয় আসার লোভে এইভাবে রাষ্ট্রের দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছে। তাহলে কাদের বিরুদ্ধে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের এই যৌথ সামরিক অভিযান? এর মধ্যেই রয়েছে দুই সরকারের সুগভীর ষড়যন্ত্র।

সকলেই জানেন, আদিবাসী সম্প্রদায়ের এই নিরীহ সরল মানুষদের জীবনে বঞ্চনা-প্রতারণা-অত্যাচারের ইতিহাস দীর্ঘদিনের। দু'শো বছরের ব্রিটিশ শাসনে জমিদার, মহাজন, আড়কাঠি ও ব্রিটিশ রাজপুরুষদের শোষণ-লুণ্ঠনে এরা নিঃস্ব, রিক্ত হয়েছে। এদের মা-বোনেরা সম্ভ্রম খুইয়েছে। সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁছে এরা বারবার বিক্ষোভে বিদ্রোহে ফেটে পড়েছে। সরকারের নিষ্ঠুর দমন-পীড়নে হাজার হাজার মানুষের রক্তে লাল হয়েছে জঙ্গলমহল। স্বাধীন ভারতেও এই বঞ্চনা-অত্যাচারের প্রশমন তো হয়ইনি, বরং মাত্রা বেড়েছে। সিপিএম সরকারের তিন দশকের শাসনেও এঁদের প্রতি দরদের অনেক বড় বড় কথা উচ্চারিত হলেও পরিস্থিতির এতটুকুও পরিবর্তন হয়নি। বরং নানা অজুহাতে পুলিসি অত্যাচার লেগেই ছিল। জঙ্গল এলাকার মানুষের দারিদ্র সীমাহীন। অধিকংশেরই জমি নেই। যাদের সামান্য কিছু আছে, তাতেও সেচের কোনও ব্যবস্থা না থাকায় চাষ অনিশ্চিত। জঙ্গলের উপর নির্ভর করে এতদিন জীবনধারণের যে ন্যূনতম উপায়টুকু তাঁরা অবলম্বন করতেন, তার উপরও কোপ নেমে এসেছে। সরকারি দলের নেতা, ফরেস্ট অফিসার, পুলিস-প্রশাসন এবং কাঠ ও পাতার ঠিকাদার চক্র তা থেকেও তাদের বঞ্চিত করেছে। জঙ্গলের বাবুই থেকে দড়ি তৈরি করে, শাল পাতা-কেন্দু পাতা তুলে, জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করে বাজারে নামমাত্র দামে সেগুলি বিক্রি করে কোনও ক্রমে আধপেটা খেয়ে না-খেয়ে টিকে থাকার সুযোগটুকুও কেড়ে নিয়েছে তারা। সরকারি তরফে যতটুকু টাকা তাঁদের উন্নয়নের নামে বরাদ্দ হয়েছে, স্তরে স্তরে তা লোপাট হয়ে গেছে, তাঁদের কাছ পর্যন্ত পৌঁছায়নি। বিপিএল তালিকা নিয়ে চলেছে ব্যাপক দুর্নীতি। আদিবাসী ছাত্রদের জন্য বরাদ্দ স্টাইপেন্ড, হোস্টেল গ্রান্টের টাকা, ইন্দিরা আবাসনের টাকা, অসহায় মহিলাদের জন্য অন্নপূর্ণা যোজনা, বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতার টাকাও লোপাট হয়ে গেছে। আজও এই এলাকায় রাস্তাঘাট নেই, স্কুল নেই, হাসপাতাল নেই, পানীয় জলের যথেষ্ট ব্যবস্থা নেই। মানুষ অশিক্ষার অন্ধকারে ডুবে রয়েছে, বিনা চিকিৎসায় মরছে। জঙ্গলমহলের অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবনের এই মর্মান্তিক দুঃখের সংবাদ বাইরের জগতে বিশেষ একটা আসে না। পাশাপাশি সিপিএম নেতা-কর্মীদের আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে। তাঁদের প্রাসাদোপম বাড়ি হয়েছে, কারও দু'চাকার, কারও চার চাকার গাড়ি হয়েছে, কেউ আদিবাসীদের উন্নয়নের কথা বলে মন্ত্রী হয়ে সেই উন্নয়নের টাকাই লুঠ করছেন।

গত তিন দশক ধরে সিপিএম নেতাদের লাগাতার চুরি-দুর্নীতি আর অত্যাচারে জর্জরিত মানুষের ক্ষোভ ক্রমাগত বাড়তে থাকে, মাঝে মাঝে

ছয়ের পাতায় দেখুন

লালগড়ে আধাসামরিক বাহিনীর আক্রমণ, পুলিশি জুলুম ও সন্ত্রাস বন্ধ করা এবং জনসাধারণের কমিটির ন্যায়সঙ্গত দাবিগুলি কার্যকর করা; খাদ্যশস্যের দাম কমানো, রেশনে নিয়মিত সরবরাহ, পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালু ও মজুতদার-অসাধু ব্যবসায়ীদের দমন করা; পিটিটিআই প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের প্রাথমিক শিক্ষকপদে নিয়োগ; আয়লা দুর্গতদের প্রয়োজনীয় ত্রাণসামগ্রী সরবরাহ, গৃহ নির্মাণ ও মেরামতির দায়িত্ব গ্রহণ, নদীবাঁধ মেরামত করা, সামরিক বাহিনীকে বাঁধ নির্মাণ ও মেরামতির দায়িত্ব দেওয়া; লোডশেডিং বন্ধ করা সহ অন্যান্য দাবিতে এস ইউ সি আই-এর ডাকে

৭ জুলাই

আইন অমান্য

জমায়েত : কলেজ স্কোয়ার

বেলা ২টা

লোডশেডিং বন্ধের দাবিতে বিদ্যুৎভবনে অ্যাবেকা-র বিক্ষোভ

লাঠিচার্জে আহত ৫০

রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানি অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবেই লোডশেডিংয়ের সমস্যাটিকে জিইয়ে রেখেছে এবং একে স্থায়ী সমস্যায় পরিণত করেছে। এই তীব্র দাবদাহের সময়েও কোম্পানি বাইরের রাজ্যে প্রতিদিন বেশি দামে বিদ্যুৎ বিক্রি করে বিপুল মুনাফা লুটছে এবং প্ল্যান্টের উৎপাদন ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ৭০ শতাংশের বেশি উৎপাদন করছে না। এরই ফলে প্রতিদিন লোডশেডিং হচ্ছে। সমস্ত প্ল্যান্টে ৯০ শতাংশ উৎপাদন নিশ্চিত করে এবং অন্য রাজ্যে বিদ্যুৎ বিক্রি বন্ধ করে অবিলম্বে লোডশেডিং বন্ধের দাবি সহ ১৮ দফা দাবিতে ২৫ জুন সারা বাংলা বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতি 'অ্যাবেকা'র প্রায় ৬ হাজারেরও বেশি সদস্য প্রচণ্ড রোদের দাপট অগ্রাহ্য করে সল্টলেকে রাজ্য বিদ্যুৎভবনে তীব্র বিক্ষোভ দেখান। বিকাশভবন থেকে মিছিল করে তাঁরা বিদ্যুৎ ভবনের সামনে পৌঁছানো মাত্রই বিরাট পুলিশবাহিনী তাঁদের দিকে লাঠি উঁচিয়ে তেড়ে আসে। গ্রাহকরা ভয় না পেয়ে এগিয়ে চলে। পুলিশ তখন ব্যাপক লাঠিচার্জ করে অন্তত ৫০ জনকে আহত করে।

অ্যাবেকা'র সভাপতি সঞ্জিত বিশ্বাসের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে বোর্ডের সেক্রেটারির কাছে দাবিপত্র পেশ করে। এই প্রতিনিধিদলে আরও ছিলেন প্রদ্যুৎ চৌধুরী, চন্দন চক্রবর্তী, দেবাশিষ চক্রবর্তী ও মদন ঘটক।

অ্যাবেকার অভিযোগ, প্রতি ঘরে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের

তিনের পাতায় দেখুন

যশপাল কমিটির সুপারিশের তীব্র বিরোধিতা ডি এস ও-র

কেন্দ্রীয় সরকার নিয়োজিত যশপাল কমিটি ২৪ জুন সর্বশেষ যে রিপোর্ট পেশ করেছে, সে প্রসঙ্গে অল ইন্ডিয়া ডি এস ও-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড সৌরভ মুখার্জী ২৫ জুন এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন,

অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে যশপাল কমিটি এও সুপারিশ করেছে যে, ইউ জি সি, এ আই সি টি ই, এম সি আই এবং এই ধরনের আরও যে সমস্ত শিক্ষাসংক্রান্ত সংস্থা রয়েছে, সেগুলির বদলে সাতজন সদস্য বিশিষ্ট একটি মাত্র নিয়ন্ত্রক সংস্থা, 'ন্যাশনাল কমিশন ফর হায়ার এডুকেশন এ্যান্ড রিসার্চ' গঠন করা হবে এবং এরাই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, নানা মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং অন্যান্য ইনস্টিটিউশনকে স্বীকৃতি দান এবং তাদের ডিগ্রি প্রদানের অধিকার দেবে। স্পষ্টতই, পুরো বিষয়টিই আসলে, দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আরও সহজে সম্পূর্ণ ব্যবসায়িক ভিত্তিতে বেসরকারি বিদ্যালয় এবং অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চালু করার সুবিধা করে দিতে, নিয়মকানুন কিছুটা শিথিল করার লক্ষ্যে নেওয়া একটি পদক্ষেপ মাত্র। সুপারিশে বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির জন্য অনুদান সম্পূর্ণ অবলুপ্ত করা হবে এবং এতদিন পর্যন্ত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির পরিকাঠামোগত এবং অন্যান্য মান সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন নিয়ন্ত্রক সংস্থার মাধ্যমে যাচাই করার যে ব্যবস্থা চালু ছিল সে রকম কিছুর অস্তিত্বও আর থাকবে না। আসলে গ্যাটস এবং ন্যাশনাল নলেজ কমিশনের প্রস্তাবেরই এ হল একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং এরও লক্ষ্য সেই বেসরকারিকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণ। শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য — মানুষ গড়ে তোলা, চরিত্রগঠন এবং বিজ্ঞানসম্মত মনন তৈরি করা; এই ধরনের শিক্ষায় এই উদ্দেশ্যের কোনটিই সফল হবে না।

তিনি বলেন, আমরা যশপাল কমিটির এই ধরনের সুপারিশগুলিকে কঠোরভাবে নিন্দা করছি এবং কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রীর কাছে দাবি রাখছি এই রিপোর্ট বাতিল করা হোক। সাথে সাথে আমরা ছাত্র, শিক্ষক এবং সমস্ত শিক্ষানুরাগী মানুষের কাছে আবেদন জানাচ্ছি, শিক্ষার বেসরকারিকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণের এই সর্বনাশা নকশাকে রূপায়িত করার লক্ষ্যে গ্যাটস্, ন্যাশনাল নলেজ কমিশন এবং যশপাল কমিটির এইসব সুপারিশের বিরুদ্ধে তীব্র গণআন্দোলন গড়ে তুলুন।

সুপারিশের প্রতিলিপি পোড়াল ছাত্ররা

সম্প্রতি লোকসভায় যশপাল কমিটির যে সুপারিশ পেশ হয়েছে তা শিক্ষার বেসরকারিকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণেরই নীল নক্সা। এর পাশাপাশি কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ মন্ত্রী কপিল সিব্বল স্কুলশিক্ষার ক্ষেত্রে দশম শ্রেণীর সমস্ত বোর্ড পরীক্ষা তুলে দিয়ে পরীক্ষা ও পাশফেল ব্যবস্থার বিলোপ ঘটিয়ে, পরিবর্তে আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন চালু করার কথা বলছেন। দেশব্যাপী অভিন্ন পাঠক্রম চালু করার যে উদ্যোগ সরকার নিচ্ছে, তার প্রকৃত লক্ষ্য হল, শিক্ষা ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের চূড়ান্ত ফ্যাসিবাদী নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা।

এর বিরুদ্ধে ২৬ জুন এ আই ডি এস ও দেশজুড়ে বিক্ষোভ দেখায়। সংগঠনের কলকাতা জেলা কমিটির পক্ষ থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ দেখানো হয় ও যশপাল কমিটির সুপারিশের প্রতিলিপি পোড়ানো হয়। এই বিক্ষোভে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সৌরভ মুখার্জী। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কমিটির পক্ষ থেকে মেদিনীপুর শহরে একটি বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করা হয়। মিছিলটি ডিএম অফিসের সামনে পৌঁছালে সেখানে একটি সভা হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নমিতা পাল। সেখানে যশপাল কমিটির সুপারিশে অগ্নিসংযোগ করেন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কমিটির আহ্বায়ক ভীম মণ্ডল।

বীরভূম

কবি নজরুল কলেজে ডি এস ও-র আন্দোলনের জয়

বীরভূম জেলার মুরারই কবি নজরুল কলেজে ভর্তি সমস্যা, ফি বৃদ্ধি, ফর্মের দাম বৃদ্ধি ও সেল্ফ ফিনান্সিং কোর্স চালু করে শিক্ষাকে ব্যবসায় পরিণত করার প্রতিবাদে ৯ জুন থেকে ১২ জুন পর্যন্ত ডি এস ও-র নেতৃত্বে লাগাতার আন্দোলন চলে। কমরেড সামিম আকতার এতে নেতৃত্বকারী ভূমিকা নেন। আন্দোলনের ফলে কলেজ কর্তৃপক্ষ ফি কমানোর দাবি সহ কিছু দাবি মেনে নেন।

আন্দোলনের আগে ও পরে ফি'র তালিকা

বিভাগ/বিষয়	আগে টাকা	পরে টাকা
বি এস সি (সাধারণ)	১২৪০	১০৫৬
বি কম (সাধারণ)	৮৬০	৬৭৬
বি কম (অনার্স)	৯৯০	৮০৬
বিএ (সাধারণ)	৮২০	৬৩৬
বাংলা (অনার্স)		
সেল্ফ ফিনান্সিং	১৯৫০	১৭৬৬
ইংরেজি (অনার্স)	২৯৫০	২৭৬৬
ইতিহাস (অনার্স)	৯৫০	৭৬৬
ভূগোল (অনার্স)	৬৭১০	৫০৫৬
রাষ্ট্রবিজ্ঞান (অনার্স)	১৯৫০	১৭৬৬
ফিজিক্যাল এডুকেশন	১৪৬০	১২৭৬
সংস্কৃত	১৩২০	১১৩৬

ধানের ন্যায্যমূল্যের দাবিতে সাঁইথিয়ায় চাষিদের অবরোধ

বোরো ধান ওঠার পর ধানের দাম নামতে নামতে ৫০০ টাকা কুইন্টালে পৌঁছেছে। ফলে চাষিদের মাথায় হাত। এমনিতেই ক্রমাগত চাষের খরচ বাড়ছে। আবার ফসল ওঠার পর তার দাম নেই। জলের দরে চাষিকে তার রক্ত জল করা ফসল পাইকার, মিল-মালিকদের হাতে তুলে দিতে হচ্ছে। মর্মান্তিক অবস্থা সাঁইথিয়া - ময়ূরেশ্বর - কোটাসুর এলাকায়। ঘূর্ণিঝড়ে পাকা ধান নষ্ট হয়েছে। যা রক্ষা পেয়েছে, চাষিরা বাজারে নিয়ে গিয়ে দাম পাচ্ছে মাত্র ৪৫০ / ৫০০ টাকা প্রতি কুইন্টাল। প্রতিকার চেয়ে বিডিও / ডিএমকে জানিয়ে কোনও ফল না হওয়ায় বীরভূম জেলা কৃষক সংগ্রাম কমিটির ডাকে ২২ জুন সাঁইথিয়া নতুন ব্রিজের কাছে বহরমপুর-সিউড়ি রাস্তা অবরোধ করা হয়। প্রবল দাবদাহ উপেক্ষা করে পাঁচ শতাধিক চাষি দু'ঘণ্টার উপর গুরুত্বপূর্ণ এই সড়ক অবরুদ্ধ করে রাখেন। পুলিশবাহিনী এলেও জোর করে অবরোধ তোলার ঝুঁকি নিতে চায়নি। পরদিন সমস্যা সমাধানে আলোচনায় বসার জন্য বিডিও-র অনুরোধে অবরোধ প্রত্যাহৃত হয়।

বৈঠকে প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলা হয়, ৭ দিনের মধ্যে ধানের দাম সংক্রান্ত সরকারি সিদ্ধান্ত জানানো হবে। নেতৃবৃন্দ আলোচনায় প্রশাসনকে জানিয়ে দেন, ধানের ন্যায্য দাম না পেলে আন্দোলন তীব্রতর হবে। একই সাথে তাঁরা বলেন, এই মরশুমে সরকারি রেটের বাইরে কালোবাজারে সার বিক্রি করার চেষ্টা হলে গোডাউনের দখল চাষিরাই নেবেন। উল্লেখ্য, গত বছর অবরোধ করলে ঐদিনই এক হাজার বস্তা সার কর্তৃপক্ষ দিতে বাধ্য হন।

পার্টিকর্মীর জীবনাবসান

বীরভূম জেলার ময়ূরেশ্বরে প্রবীণ এস ইউ সি আই কর্মী কমরেড মুলুক সেখ ১৯ মে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। ১৯৬৭ সালে সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি দলের সাথে নিজেকে যুক্ত করেন। তাঁরই উদ্যোগে ময়ূরেশ্বরে দলের কাজ শুরু হয়েছিল।

১৯ জুন ময়ূরেশ্বর হাইস্কুলে তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পার্টির কর্মী-সমর্থক ছাড়াও তাঁর গুণমুগ্ধ বহু সাধারণ মানুষ উপস্থিত ছিলেন। জেলা পার্টির পক্ষ থেকে কমরেড মুলুক সেখের রাজনৈতিক জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন কমরেড আবদুস সালাম ও মানস সিনহা।

কমরেড মুলুক সেখ লাল সেলাম

ডি এস ও-র নদীয়া জেলা শিক্ষাশিবির

১৪ জুন অল ইন্ডিয়া ডি এস ও-র নদীয়া জেলা শিক্ষাশিবির অনুষ্ঠিত হয় পলাশির জানকীনগর হাইমাদ্রাসায়। মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক পথপ্রদর্শক কমরেড শিবদাস ঘোষের 'গণআন্দোলনের সমস্যা ও ছাত্রদের কর্তব্য' বইটি নিয়ে প্রশ্নভিত্তিক আলোচনা হয়। এ ছাড়া শিক্ষায় ফি বৃদ্ধি, ডোনেশন, গ্রেডেশনপ্রথা, স্কুলস্তরে যৌনশিক্ষা, ভর্তি সমস্যা সমাধান, শিক্ষাসংস্কৃতির উপর আক্রমণ, ছাত্রজীবনে রাজনীতি করা উচিত কি না, ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। শিক্ষাশিবিরে অংশগ্রহণ করেন কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজ, ডি এল রায় কলেজ, রানাঘাট কলেজ, মাজদিয়া কলেজ, চাপড়া কলেজ, বেথুয়াডহরী কলেজ, বেতাই বি আর আম্বেদকর কলেজ ছাড়াও বেলডাঙা এস আর এফ কলেজের ছাত্ররা এবং জেলার বিভিন্ন স্কুল থেকে অংশগ্রহণকারী ছাত্রপ্রতিনিধিরা।

প্রধান আলোচক সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কমরেড সৌরভ মুখার্জী শিক্ষার উপর ক্রমবর্ধমান আক্রমণের বিরুদ্ধে তীব্র ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি কমরেড গোপাল সাহু ও এস ইউ সি আই নদীয়া জেলা কমিটির সদস্য কমরেড বসির আহমেদ।

সংগঠনের জেলা সম্পাদক কমরেড কামালউদ্দিন ও সভাপতি সিকান্দার আলির নেতৃত্বে প্রায় দুই শতাধিক ছাত্রছাত্রী শিক্ষায় ফি-বৃদ্ধি, ডোনেশন, গ্রেডেশন প্রথা, স্কুলস্তরে যৌন শিক্ষা, ভর্তি ফর্মের দামবৃদ্ধি, কলেজে কলেজে এস এফ আই-এর সন্ত্রাস প্রভৃতির বিরুদ্ধে এবং মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিকে উত্তীর্ণ সকল ছাত্রছাত্রীর ভর্তি ও পিটিটিআই ছাত্রদের সমস্যা অবিলম্বে সমাধানের দাবিতে মিছিল করে।

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ডি এস ও-র বিক্ষোভ

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন বিভিন্ন কলেজের ভর্তি সংক্রান্ত নানা সমস্যা নিয়ে ১৬ জুন অল ইন্ডিয়া ডি এস ও-র পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কমিটির পক্ষ থেকে উপাচার্যের দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখানো হয় এবং তাঁর কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। কলেজগুলি থেকে প্রায় তিন শতাধিক ছাত্রছাত্রী, সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড নমিতা পালের নেতৃত্বে মেদিনীপুর রেল স্টেশন থেকে মিছিল করে শহর ঘুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে বিক্ষোভ দেখায়। বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন ডি এস ও-র সংগঠক কমরেড অনুপ মান্না, ভীম মণ্ডল, সরোজ মাইতি প্রমুখ। এরপর কমরেড চিন্ময় ঘোড়াই ও তপন সামন্তের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধিদল ১০ দফা দাবি নিয়ে উপাচার্যের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ ধরে আলোচনা করেন। দাবিগুলি ছিল — (১) ফর্মের দাম ছাপা খরচের বেশি নেওয়া চলবে না; (২) পাশ ও অনার্সে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে; (৩) দুর্গত এলাকায় ছাত্রছাত্রীদের ফি মকুব করতে হবে; (৪) অতিরিক্ত ফি নেওয়া চলবে না; (৫) প্রতিটি কলেজে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সমহারে ফি চালু; (৬) সেল্ফ ফিনানসিং কোর্স বাতিল করে সরকারি উদ্যোগে নতুন নতুন বিষয়ে অনার্স চালু; (৭) ভর্তির ক্ষেত্রে দলবাজি ও দুর্নীতি বন্ধ; (৮) অতিরিক্ত ফি বাতিল করে ও সরকারি কলেজে আসন বৃদ্ধি করে বি এড কাউন্সেলিং শুরু করতে হবে; (৯) শূন্যপদে অধ্যাপক নিয়োগ করতে হবে; (১০) কোর্স ফি, একাডেমিক ফি নেওয়া ও ইউনিয়ন ফি বৃদ্ধি করা চলবে না। এই দাবিগুলির সঙ্গে সহমত পোষণ করে উপাচার্য পাশ ও অনার্সে ১০ শতাংশ আসন বৃদ্ধি ও পাস কোর্সে কলেজ কর্তৃপক্ষ নিজের মতো সেশন ভাগ করে ভর্তি নেওয়া, দুর্গত এলাকায় ছাত্রদের ফি মকুব সহ সেল্ফ ফিনান্সিং কোর্স কিছু কিছু কলেজে বাতিল করা, শূন্যপদে অধ্যাপক নিয়োগ এবং বি এ-এর ভর্তি সংক্রান্ত সমস্যা দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দেন। ডেপুটেশন শেষে উপস্থিত ছাত্রছাত্রীদের সামনে কমরেড নমিতা পাল বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কিছু দাবি মানলেও আন্দোলন চলবে। অপূরিত দাবিগুলি নিয়ে কলেজে কলেজে ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান তিনি।

সিপিএমের হামলার প্রতিবাদে

জয়নগর ২নং ব্লকে বন্‌ধ

২৪ জুন জয়নগর ২নং ব্লকের নলগোড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে ৩টি শিশুশিক্ষা কেন্দ্রে অভিভাবক কমিটির নির্বাচন চলাকালীন স্থানীয় সিপিএম নেতা ও পঞ্চায়েত প্রধান কালিদাস মণ্ডলের নেতৃত্বে সমাজবিরোধীরা লোহার রড, লাঠি, পাইপগান নিয়ে উপস্থিত অভিভাবক ও এস ইউ সি আই কর্মীদের উপর নৃশংস হামলা করে। মহিলা অভিভাবকদের বুকে, পেটে, নিম্নাঙ্গে নির্মমভাবে লাঠি দিয়ে আঘাত করে। এই আক্রমণে পুরুষ-মহিলা সহ ৩৩ জন আহত হন। ১৭ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে। ২০টি বাড়ির সর্বস্ব লুঠ করেছে দুষ্কৃতীরা। তারপর থেকে বাড়ি বাড়ি হুমকি, হামলা চলছে। এই আক্রমণের প্রতিবাদে এস ইউ সি আই ২৬ জুন জয়নগর ২নং ব্লকে বনধের ডাক দেয়। অবিলম্বে সিপিএম নেতা কালিদাস মণ্ডল সহ সমস্ত সমাজবিরোধীদের গ্রেপ্তার; পুলিশের নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন; এলাকায় দ্রুত সন্ত্রাসের অবসানের জন্য পুলিশ প্রশাসনের উদ্যোগী হওয়া; ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ ও আহতদের চিকিৎসার দায়িত্ব প্রশাসন কর্তৃক নেওয়ার দাবিতে ডাকা বন্‌ধ সর্বাত্মক ভাবে সফল হয়।

সরকার চাইলে মূল্যবৃদ্ধি রোধ করতে পারে

নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধিতে সাধারণ মানুষের জীবন বিপর্যস্ত। গত কয়েক মাসে এই দামবৃদ্ধি ২৫-৩০ শতাংশ ছাড়িয়ে গেছে। বাজারে গিয়ে মানুষ ক্ষোভে ফুঁসছে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারে যারা ক্ষমতাসীন, মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে তাদের কোনও হেলদোলই নেই। ফলে, মূল্যবৃদ্ধি ঘটবেই, এ বোঝা বইতেই হবে, এ নিয়ে কিছু করার নেই — এ রকম একটা মানসিকতা জনসাধারণের মধ্যে গড়ে উঠেছে। অনন্যোপায় হয়ে বিপর্যস্ত স্বল্প আয়ের মানুষেরা খাদ্যদ্রব্যসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের ব্যবহার কমাতে বাধ্য হচ্ছেন। আর তার পরিণামে অর্ধাহার-অপুষ্টি ইত্যাদি সমস্যা বাড়ছে।

এমনিতেই সারা দেশে এবং আমাদের রাজ্যেও অপুষ্টির চিত্র ভয়ঙ্কর। স্বাস্থ্য রক্ষার্থে প্ল্যানিং কমিশন মাথাপিছু দৈনিক গ্রামীণ এলাকায় ২৪০০ ক্যালরি যুক্ত খাদ্য এবং শহর এলাকায় ২১০০ ক্যালরি যুক্ত খাদ্য ধার্য করেছে। জাতীয় নমুনা সমীক্ষায় (১৯৯৯-২০০০) দেখা যাচ্ছে, এই মাত্রার খাদ্য থেকে পশ্চিমবঙ্গে গ্রামের অধিবাসীদের শতকরা ৭৭ জন বঞ্চিত; শহরের ক্ষেত্রে বঞ্চিত ৫৯ শতাংশ। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিকেল রিসার্চ (আই সি এম আর) নির্ধারিত সুষম খাদ্যের তালিকায় দেখা যাচ্ছে একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ, যিনি মাঝারি মাপের পরিশ্রম করেন, তাকে দৈনিক ৫২০ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট, ১৭০ গ্রাম শাকসবজি, ৩৫ গ্রাম চিনি, ৪৫ গ্রাম ফ্যাট, ২০০ গ্রাম দুধ, ৩০ গ্রাম ডাল, একটি ডিম বা ৩০ গ্রাম মাছ/মাংস গ্রহণ করতে হবে। এন এস এস দেখিয়েছে, অধিকাংশ মানুষেরই এর অর্ধেকও জোটে না। এই অবস্থায় খাদ্যদ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির ফলে সাধারণ মানুষ খাদ্য আরও জোটাতে পারবে না। পরিণামে বাড়বে আরও অপুষ্টি, আরও অকালমৃত্যু। এরকম একটা সঙ্কটময় অবস্থার মধ্যে সাধারণ মানুষকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। এই ভয়ঙ্কর অবস্থা থেকে বাঁচার পথ কী? মূল্যবৃদ্ধিরোধ করার উপায়ই বা কী?

মূল্যবৃদ্ধি রোধ করার উপায় বের করতে হলে কীভাবে কারা মূল্যবৃদ্ধি ঘটাচ্ছে প্রথমেই সেই চক্রটিকে চেনা দরকার। ধরা যাক আলুর মূল্যবৃদ্ধির কথা। গত বছর এই সময়ে সাধারণ আলুর দাম ছিল ৫-৬ টাকা কেজি। এবার সেই আলুর দাম ১৫-১৬ টাকা। অর্থাৎ, দাম বেড়েছে ২০০ শতাংশ। কারা এই দাম বাড়াল? কেন বাড়ল?

একদল পণ্ডিত যুক্তি দিচ্ছে, ধসারোগের কারণে এবার আলুর উৎপাদন কম হয়েছে, তাই এই মূল্যবৃদ্ধি। ধসার কারণে আলুর উৎপাদন কম হয়েছে একথা ঠিক, কিন্তু তবুও উৎপাদন হয়েছে প্রয়োজনের থেকে ১০ লক্ষ টন বেশি। রাজ্যে আলুর প্রয়োজন ৫০ লক্ষ টন। আর উৎপাদন হয়েছে ৬০ লক্ষ টন। ফলে জোগান কম একথা সত্য নয়। দ্বিতীয়ত, বাজারে দাম দিলে আলু যথেষ্টই পাওয়া যাচ্ছে। ফলে যোগান কমের যুক্তি অচল। তাহলে কেন এই দামবৃদ্ধি?

এই প্রতিবেদন লেখার সময়ও সরকারি হিসাবে মুদ্রাস্ফীতি শূন্যের নীচে। মুদ্রাস্ফীতি কমলে জিনিসপত্রের দাম কমে। স্বাভাবিকভাবেই জিনিসপত্রের দাম কমার কথা। কিন্তু কমা তো দূরের কথা, দাম বেড়েই চলেছে।

পণ্য পরিবহণের খরচ কমলেও জিনিসপত্রের দাম কমে। আন্তর্জাতিক বাজারে পেট্রল ডিজেলের দাম কমার পরিপ্রেক্ষিতে কয়েক মাস আগে এদেশেও দাম কমেছে। কমেছে পরিবহণের ভাড়াও। ফলে পণ্য আনা নেওয়ার খরচও কমেছে। সেই হিসাবেও জিনিসপত্রের দাম কমার কথা। কিন্তু কমার পরিবর্তে দাম বেড়েই চলেছে।

এ রাজ্যে কৃষকের আর্থিক দুরবস্থার খবর যারা রাখেন তারা জানেন, মে-জুন মাস পর্যন্ত কৃষকরা আলু ধরে রাখতে পারে না। তার আগেই অভাবি বিক্রি হয়ে যায়। ফলে এই মুহূর্তে কৃষকের হাতে আলু নেই বললেই চলে। বৃহৎ ব্যবসায়ীরা বাজার থেকে আলু কিনে হিমঘরে মজুত করে রেখেছে। আগে হিমঘরে আলু রাখত কৃষকরা, এখন হিমঘরের সিংহভাগ জায়গা সিপিএম সরকারের বদান্যতায় দখল করে রেখেছে বৃহৎ ব্যবসায়ীরা। হিমঘরের মালিকরাও আলু রাখতে শুরু করেছে। ফলে সমস্ত আলু ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণে চলে গিয়েছে। বিকল্প কোন জায়গা থেকে আলু কেনার ব্যবস্থা নেই। আলু কী দামে বাজারে বিক্রি হবে এ নিয়ে সরকারের কোন নির্দেশিকাও নেই। এই অবস্থায় বৃহৎ ব্যবসায়ীরা, মজুতদারেরা যে দাম চাইছে সেই দামেই উপভোক্তাকে আলু কিনতে হচ্ছে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, বৃহৎ ব্যবসায়ীরাই আলুর উপর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে দাম বাড়াচ্ছে। এরাই হচ্ছে আসল অপরাধী, যারা জিনিসপত্রের দাম মাত্রাছাড়া বাড়িয়ে দিয়ে দেশের ৮০ ভাগ মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। ফলে মূল্যবৃদ্ধির পেছনে কাজ করছে প্রধানত মজুতদারি ব্যবস্থা।

এই মজুতদারির উপর লাগাম পরানো যায় দুটি উপায়ে। এক, অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইন কঠোরতর করে এবং তা কঠোরভাবে প্রয়োগ করে, মজুতদারদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিয়ে, সরকারি উদ্যোগে মজুত উদ্ধার করে এবং সেগুলি ন্যায্য দামে জনসাধারণের কাছে বিক্রি করে। এই কাজটি বর্তমান সাংবিধানিক এবং আইনি কাঠামোর মধ্যে অনায়াসেই করা যায়।

দ্বিতীয় পথটি হল, ব্যবসায়ীরা যাতে মজুতই করতে না পারে তার বাস্তব অবস্থা তৈরি করা। কীভাবে তা করা যায়? তা করা যায় নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের ক্ষেত্রে, অন্তত খাদ্যের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ব্যবসা নিষিদ্ধ করে সরকারি আওতায় ব্যবসা চালু করে। অর্থাৎ, সরকার উৎপাদকের কাছ থেকে সমস্ত পণ্য ন্যায্য দামে কিনবে এবং সেগুলি সারা দেশে বা সারা রাজ্যে ক্রেতাদের এক দরে বিক্রি করবে। অর্থাৎ, রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালু করতে পারলে মজুতদারি বন্ধ করা যায়। ফলে মূল্যবৃদ্ধি রোধ করা যাবে না, মূল্যবৃদ্ধির বোঝা বয়ে যেতেই হবে, এর ব্যতিক্রম হবার জো নেই — এ চিন্তা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।

মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারের ভূমিকা কী? এ প্রসঙ্গ উঠলেই কংগ্রেসী নেতারা ধানাই-পানাই করে বলেন,মূল্যবৃদ্ধি রোধ তো করাই উচিত। ব্যস, এই পর্যন্তই। কংগ্রেস সরকার মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যআইন কঠোর করা দূরে থাক, তা শিথিল করেছে। এই শিথিল আইনটুকুও প্রয়োগ করেনি, কোনও অসাধু ব্যবসায়ীকে, মজুতদারকে গ্রেপ্তার পর্যন্ত করেনি। ৫০-এর দশকে এস ইউ সি আই রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য প্রবর্তনের জোরালো দাবি তুলেছিল। তখন রাজ্যে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস সরকার এই দাবির প্রতি কোনও কর্ণপাত করেনি। আজও কেন্দ্রীয় সরকার এই দাবি মেনে নিচ্ছে না। কেন কংগ্রেস সরকার এই দাবি উপেক্ষা করছে? কারণ কংগ্রেস তার শ্রেণীচরিত্র অনুযায়ী বৃহৎ ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে, মালিকদের বিরুদ্ধে যেতে পারে না। সেই কারণে মূল্যবৃদ্ধির আগুনে জনগণ পুড়লেও কংগ্রেস নেতাদের অন্তরাত্মা জাগে না। কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থমন্ত্রী হয়েছেন এ রাজ্য থেকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি প্রণব মুখার্জী। মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে তাঁর মুখে একটি কথাও শোনা যাচ্ছে না।

অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের ব্যবস্থা করা একটা সরকারের ন্যূনতম দায়িত্ব। কিন্তু কংগ্রেস সরকার তা পালন করছে না। কংগ্রেস জনগণকে খাওয়াবার দায়িত্ব কোনও কালেও স্বীকার করেনি। রেশনের মাধ্যমে কম দামে খাদ্য পাওয়ার যতটুকু সুযোগ ছিল, কংগ্রেস সরকার এপিএল-বিপিএল বিভাজন করে একটা বিরাট অংশের মানুষকে রেশনের চাল-গম প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করেছে। রেশনে বরাদ্দও কমিয়ে দিয়েছে। সরকারি ভাণ্ডারে খাদ্য সংগ্রহের নমুনা দেখলেই বোঝা যায়, সরকার জনগণকে খাওয়াবার বিষয়টিকে কত অবহেলার চোখে দেখে। ভারতের কৃষি মন্ত্রকের হিসাব অনুযায়ী, কেন্দ্র ও রাজ্য মিলিয়ে ২০০১ থেকে ২০০৩ সালে চাল ও গমের মজুত ছিল যথাক্রমে ৪.৫৭, ৫.৮১ এবং ৪.৮২ কোটি টন। ২০০৮ সালে এই মজুত কমে হয় মাত্র ১.৯১৮ কোটি টন (আনন্দবাজার পত্রিকা ২২-৬-০৯)। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, খরা-বন্যা-সাইক্লোনে জনগণের পাশে দাঁড়াবার মতো পরিকাঠামো সরকারের নেই। এই হচ্ছে জনগণকে খাওয়ানোর বিষয়ে কংগ্রেস সরকারের ঐকান্তিকতার নমুনা।

মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে রাজ্যের সিপিএম সরকারের ভূমিকাও চূড়ান্ত নৈরাশ্যজনক। ১৯৬৭-৬৯ সালে পশ্চিমবঙ্গে অ-কংগ্রেসী যুক্তফ্রন্ট সরকারের শরিক হিসাবে এস ইউ সি আই রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের দাবি তুললেও সিপিএমের বাধার কারণেই তা যুক্তফ্রন্ট সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়নি। রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের প্রবর্তন সিপিএম চায়নি বৃহৎ ব্যবসায়ীদের স্বার্থে। নানা অজুহাতে এর বিরোধিতা করে গেছে। সেইসময় সিপিএম প্রশ্ন তুলেছিল, রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য প্রবর্তন করলে হাজার হাজার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী বেকার হয়ে পড়বে। এস ইউ সি আই পরিষ্কারভাবেই দেখিয়েছিল, এই খুচরো দোকানদারদের লাইসেন্স দিয়ে তাদের মাধ্যমে সরকার-নির্ধারিত দামে বিক্রির ব্যবস্থা করলে এই দোকানদারদের বেকার হওয়ার প্রশ্নই নেই। কিন্তু এই যুক্তি সিপিএম মানে নি। ফলে এস ইউ সি আই চাইলেও রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য প্রবর্তন যুক্তফ্রন্ট সরকারকে দিয়ে করানো সম্ভব হয়নি।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে যাওয়া দরকার। যে সিপিএম খুচরো দোকানদারদের স্বার্থের কথা বলে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য প্রবর্তনের বিরোধিতা করেছে, সেই সিপিএম আজ দেশি-বিদেশী বৃহৎ পুঁজিপতিদের শপিং মল করার লাইসেন্স দিয়ে হাজার হাজার খুচরো ব্যবসায়ীকে বিপন্ন করে তুলেছে। ফলে সেদিন রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য প্রবর্তনের যে বিরোধিতা সিপিএম করেছিল তার মূলে যেমন ছিল বৃহৎ ব্যবসায়ীদের স্বার্থ দেখার তাগিদ, তেমনি আজ শপিং মলের লাইসেন্স দেওয়ার পিছনেও রয়েছে একই বৃহৎ ব্যবসায়ীদের স্বার্থরক্ষার তাগিদ।

মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ প্রসঙ্গে অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত ২৩ মে বলেছিলেন, 'রাজ্যের হাতে যে ক্ষমতা আছে সেই ক্ষমতা নিয়েই বেআইনি মজুত উদ্ধারে নামবে প্রশাসন' (গণশক্তি ২৪-৫-০৯)। একমাস পার হয়ে গেল কোনও বেআইনি মজুত উদ্ধার করতে অসীমবাবুদের দেখা গেল না, কোনও হিমঘরের তালা ভেঙে আলু বের করা হল না।

এই মজুতদারদের বাঁচাতে কংগ্রেস সরকার যখন অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইন শিথিল করল, সিপিএম তখন তার পাশেই দাঁড়াল, একটি প্রতিবাদ পর্যন্ত করেনি। ইউ পি এ-র শরিক হিসাবে তখনও বলেনি এই আইন কঠোর করতে। কংগ্রেস সিপিএম দুই সরকারই এভাবে একচেটিয়া মালিকদের স্বার্থরক্ষা করে চলেছে। বিনিময়ে মালিকরা তাদেরকে কোটি কোটি টাকা দিচ্ছে। এই দলগুলি পুঁজিপতিদের কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা পেয়ে দেশের ৮০ ভাগ সাধারণ মানুষের স্বার্থ বুর্জোয়াদের স্বার্থের কাছে বলি দিচ্ছে। ধুঁকে ধুঁকে মরছে সাধারণ মানুষ। মুনাফাভিত্তিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার এই হচ্ছে বৈশিষ্ট্য। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষ খেয়ে পরে বেঁচে থাকতে পারবে কিনা, তাঁর কোনও নিশ্চয়তা নেই। এই ব্যবস্থা টিকে থাকার অর্থ হল মুষ্টিমেয় পুঁজিপতির সমৃদ্ধি, আর দেশের বিরাট সংখ্যক সাধারণ মানুষের দুর্দশার বৃদ্ধি। এই বৈষম্যের সমাজ শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারে না।

মূল্যবৃদ্ধি রোধ করার দাবি একটা মামুলি দাবি নয়। মানুষের বেঁচে থাকার সাথে এই দাবি সম্পর্কিত। আজ প্রয়োজন মূল্যবৃদ্ধি রোধে অতি দ্রুত সরকারকে মজুত উদ্ধারে নামতে বাধ্য করা, প্রয়োজন অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইন কঠোর করে কঠোরভাবে প্রয়োগ করা এবং মজুতদারি আটকাতে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য প্রবর্তন করা। এই দাবিতে এস ইউ সি আই আবারও আন্দোলনের ডাক দিয়েছে। ৩০ জুন রাজ্য জুড়ে জেলাশাসকের দপ্তরে গণঅবস্থান পালিত হয়েছে। ৭ জুলাই কলকাতায় গণআইন অমান্যের ডাক দেওয়া হয়েছে। সাধারণ মানুষকে বুঝতে হবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মূল্যবৃদ্ধির আঘাত পুরোপুরি বন্ধ করা সম্ভব নয়, কিন্তু রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য প্রবর্তন করলে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ অবশ্যই করা যায়।

বিদ্যুৎভবনে অ্যাবেকা-র বিক্ষোভ

একের পাতার পর

পক্ষ থেকে কোম্পানির হাতে ৬ হাজার কোটি টাকা তুলে দেওয়া সত্ত্বেও আজও বিদ্যুতায়নের কাজ শুরু করাই হয়নি।

অ্যাবেকার আরও অভিযোগ, বিদ্যুৎ আইনে এক মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার কথা থাকলেও কোম্পানি তা কার্যকর করছে না। আবেদনকারীর কাছ থেকে কী কারণে কত টাকা দাবি করা হচ্ছে, তাও জানানো হচ্ছে না। এমনকী, বিদ্যুৎ আইনে মিটার বোর্ড থেকে ৩৩ মিটার পর্যন্ত লাইন টানার যাবতীয় খরচ কোম্পানিকে বহন করতে হবে বলা হলেও কোম্পানি সেই আইন লঙ্ঘন করে গ্রাহকদের থেকে সেই টাকা আদায় করে নিচ্ছে, যা সম্পূর্ণ বেআইনি। শুধু তাই নয়, এই সব বেআইনি আবদার মেনে নিয়ে টাকা জমা দিয়েও হাজার হাজার গ্রাহক বিদ্যুৎ সংযোগ পাচ্ছে না। কারণ, মিটার সাপ্লাই নেই। এই মিটার সরবরাহের বিষয়টি নিয়ে কোম্পানির চেয়ারম্যানের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে, কিন্তু আজও সমাধান হয়নি।

দাবিপত্রে আরও বলা হয়েছে, কৃষিগ্রাহকদের মিটারের সমস্যাটি দীর্ঘদিন ধরে সমাধান না করে রাজ্যের লক্ষাধিক কৃষিবিদ্যুৎ গ্রাহককে কোম্পানি হেনস্থা করেই চলেছে। ট্রান্সফর্মার খারাপ হলে বা পুড়ে গেলে গ্রাহকরা নতুন ট্রান্সফর্মার পাচ্ছে না। চুরি যাওয়া তার লাগানো হচ্ছে না। ট্রান্সফর্মার চোরদের গ্রেপ্তারের কোনও চেষ্টা নেই। কারণ, কন্ট্রাক্টর, কোম্পানির কর্মচারী ও পুলিশের মিলিত দুষ্টচক্র এর সঙ্গে যুক্ত। এই বাস্তুঘুঘুদের গায়ে হাত দেওয়ার ক্ষমতা কোম্পানির নেই। এর ফলে রাজ্যের বিদ্যুৎগ্রাহকদের হেনস্থা হতে হচ্ছে। কৃষিবিদ্যুৎ গ্রাহকদের ফসল নষ্ট হচ্ছে। গ্রামীণ ক্ষুদ্রশিল্প বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এমনকী পোলগুলির সংস্কার পর্যন্ত করা হচ্ছে না।

কোম্পানি এতটাই অমানবিক ও আমলাতান্ত্রিক যে, ঘূর্ণিঝড় আয়লায় চূড়ান্ত বিপর্যস্ত মানুষগুলোর কাছ থেকেও বিদ্যুৎ বিল আদায়ের চেষ্টা চালাচ্ছে। এই মানুষদের জন্য ১৫ দিনের মধ্যে বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যবস্থা করার এবং এক বছরের বিল মকুবের দাবি চেয়ারম্যানের কাছে জানানো হয়। সেই সঙ্গে পুনরায় মাশুল বৃদ্ধির পরিকল্পনারও তীব্র বিরোধিতা করা হয়।

সংকটে জর্জরিত পুঁজিবাদী দুনিয়া

বিশ্বপুঁজিবাদী সংকটের আঁচ ধীরে ধীরে অসহনীয় তাপে পরিণত হচ্ছে। সংবাদপত্রের খবর এবং অর্থনীতিবিদদের কৌতূহল ছাড়িয়ে তা এখন সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকাকেই অসম্ভব করে তুলেছে। উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলি সংকটে হাবুডুবু খাচ্ছে। আবার তারা চেষ্টা করছে সংকটের বোঝাটা অনুন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির ঘাড়ে চাপাতে। ফলে, দুজন ডুবন্ত মানুষ যেমন গলা জড়াজড়ি করে ডোবে, তেমনি কি উন্নত, কি অনুন্নত, গোটা পুঁজিবাদী দুনিয়া ডুবছে। ইতিমধ্যেই ছাঁটাইয়ের কোপ নেমে এসেছে সব ধরনের শিল্পে। সম্প্রতি ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের মতো সংস্থা, কর্মচারীদের একমাস বিনাবেতনে কাজ করার অনুরোধ করেছে। একই কৌশলে এয়ার ইন্ডিয়া কর্মচারীদের জুলাই মাসের বেতন না নিতে অনুরোধ করেছে। বিশ্বব্যাপী সংকট এবং কর্মচ্যুতির রক্তচক্ষুর পরিপ্রেক্ষিতে ‘অনুরোধ’ আর ‘হুমকি’র মধ্যেকার পার্থক্য মুছে গিয়েছে।

সংকট ক্রমাগত ছড়িয়ে পড়েছে অর্থনীতির এক ক্ষেত্র থেকে অন্য ক্ষেত্রে। শুরু হয়েছিল বন্ধকী কারবারকে ভিত্তি করে অর্থলগ্নী সংস্থায়; তারপর একে একে ধাতুশিল্প, নির্মাণশিল্প, মোটরগাড়ি সহ ভোগ্যপণ্য শিল্প, পরিষেবা, তথ্যপ্রযুক্তি সর্বত্র সংকট ছড়িয়ে পড়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেবল লেম্যান ব্রাদার্স নয়, আমেরিকার গর্ব জেনারেল মোটর্স দেউলিয়া হয়ে গিয়েছে। জেনারেল মোটর্স তার বিশ্বখ্যাত ব্র্যান্ড ওপাল বা হামার বিক্রি করে দিয়েছে। মার্কিন দেশে প্রতিদিন হাজারে হাজারে মানুষ চাকরি খোয়াচ্ছেন। আই এল ও-র সাম্প্রতিক হিসাবে দেখা যাচ্ছে ২০০৯ সালে বিশ্বে বেকার হবে ২৩ কোটি ৯০ লক্ষ মানুষ। এর আগে আই এল ও-রই পূর্বাভাস ছিল বেকার হবে ৫ কোটি ২০ লক্ষ। এক ধাক্কায় সংখ্যাটা প্রায় ৫ গুণ বেড়ে যাওয়া থেকেই বোঝা যায়, সংকট বাড়ছে যাবতীয় অনুমানকে পিছনে ফেলে।

উদারীকরণের প্রবক্তারা বলেছিলেন, ভারত যদি বিদেশি পুঁজির দরজা খুলে দেয়, তবে আধুনিক প্রযুক্তি আসবে এবং রপ্তানিযোগ্য গুণমানের পণ্য উৎপাদন করা যাবে। পুরনো প্রযুক্তিতে তা সম্ভব নয়। এরপর ভারত ধরবে রপ্তানির বাজার। এদিকে দেশের মানুষ ক্রমশ গরিব হচ্ছে, আভ্যন্তরীণ চাহিদা পড়ছে, এ অবস্থায় অর্থনীতির অগ্রগতি হবে কী করে? এর উত্তরে সরকারি কর্তারা বললেন, রপ্তানির তরণী বেয়ে তরতরিয়ে চলবে অর্থনীতির তরী। সেজন্য বিদেশি পুঁজির জন্য দরজা খুলে দাও। বিদেশি পুঁজি যত না এসেছে উৎপাদনে, তার চেয়ে বেশি এসেছে শেয়ার বাজারে। ফলত ডলার এসেছে চাহিদার চেয়ে বেশি, তাতে কম টাকাতেই ডলার মিলছিল অর্থাৎ ডলারের তুলনায় টাকার দাম বেড়ে যায়। ভারতের রপ্তানি পণ্যের দামও বাড়ে। একেই মন্দার ধাক্কায় উন্নত দেশগুলিতে চাহিদা কমছে তার উপর রপ্তানি পণ্যের দাম বাড়ায়, কমেছে রপ্তানির বাজার। সম্প্রতি রপ্তানি কমেছে প্রায় ১৫ শতাংশ। ভারত সরকার উৎসাহ ভাতা দিয়েও রপ্তানি বাজার তেজি করতে পারছে না। সকল পুঁজিবাদী দেশই যদি রপ্তানি করে অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে চায় তবে এত আমদানি করবে কে? সকল পুঁজিবাদী দেশেরই রপ্তানির লক্ষ্য হল, মার্কিন বাজার। চীন, ভারত, জাপান সকলেই রপ্তানি করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, অথচ মন্দার ধাক্কায় মার্কিন বাজারে সংকট। মার্কিন আমদানি কমেছে ৩৪ শতাংশ, ফলে মার্কিন বাজারের ওপর নির্ভরশীল রপ্তানিকারক দেশগুলির নাভিশ্বাস উঠছে।

বিশ্বায়নের প্রবক্তাদের কথিত রপ্তানিনির্ভর আর্থিক প্রবৃদ্ধি যে পুরোপুরি ধোঁকা, তা ধরা পড়ে গিয়েছিল, ৯০ দশকের শেষদিকে। তখন রপ্তানির বাহনে চেপে দ্রুত ছুটছে দক্ষিণ কোরিয়া। ১৯৮৯ সালে দক্ষিণ কোরিয়ার রপ্তানি ছিল মাথাপিছু ১৩৬৫ ডলার। দক্ষিণ কোরিয়াকে তখন পুঁজিবাদী অগ্রগতির নজির বলা হচ্ছিল। অথচ হিসাবে দেখা যাচ্ছিল, এই হারে যদি চীন ও পশ্চাদপদ পুঁজিবাদী দেশগুলি রপ্তানি করতে চায় তবে মোট রপ্তানি হতে হবে ৫.০ ট্রিলিয়ন ডলার, অথচ ১৯৮৯ সালে বিশ্ববাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ২.১ ট্রিলিয়ন ডলারেরও কম। অর্থাৎ, রপ্তানির এতবড় বাজারই সেদিন ছিল না। এখন সেই বাজার আরও কমছে মন্দার ধাক্কায়।

পুঁজিবাদী বিকাশের একদা দৃষ্টান্ত ছিল জাপান। মার্কিন আমদানির ওপর নির্ভরশীল জাপান এবছর মার্চে গত বছরের তুলনায় ৪৫.৫ শতাংশ রপ্তানি খুইয়েছে। ফলত তার সামগ্রিক অর্থনীতি ১৫.২ শতাংশ সংকুচিত হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরাজয়ের অব্যবহিত পরে, ১৯৫৫ থেকে আজ পর্যন্ত এত খারাপ অবস্থায় জাপান আর পড়েনি। মার্কিন বাজারে চীন ও ব্রাজিলের রপ্তানি ২০ শতাংশ মার খেয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাফটা জোটের সঙ্গী মেক্সিকো ২৯ শতাংশ রপ্তানি খুইয়েছে। ভারতের রপ্তানি বাজারও সামগ্রিকভাবে কমবেশি ১৫ শতাংশ মার খেয়েছে। তার ওপর ভারতের একটা বড় ব্যবসা ছিল উন্নত দেশের বাজারে সস্তা মেধাশক্তি বিক্রি। সস্তায় ইঞ্জিনিয়ার, কম্পিউটার প্রযুক্তিবিদ নিয়োগ করে কাজ করিয়ে নিতে বিদেশি সংস্থা ভারতে কাজ পাঠাচ্ছে। যাকে বলা হচ্ছে আউটসোর্সিং। মন্দার ফলে সেই কাজও আসছে কম। এজন্য তথ্য প্রযুক্তি শিল্পে সংকট। দু'দিন আগেই একে বলা হয়েছিল উদীয়মান শিল্প। কিন্তু সূর্য ভালো করে ওঠার আগেই তা পাটে বসতে শুরু করেছে। সংকটে ডুবছে গোটা দুনিয়া।

শিক্ষায় ফি-বৃদ্ধির প্রতিবাদে ২২ জুন পাটনায় ডিএসও-র বিক্ষোভ

ঘূর্ণিঝড়ের এক মাস পরেও গোসাবার মানুষের দুর্গতি সীমাহীন

শুধু ডায়েরিয়া নয়, ভয়াবহ কলেরা এবং ম্যালেরিয়াও ব্যাপকহারে ছড়িয়ে পড়ছে ঘূর্ণিঝড় বিধ্বস্ত সুন্দরবনের এলাকাগুলিতে। কিন্তু বাইরের দুনিয়া কি তার খবর পাচ্ছে? ঘূর্ণিঝড়ের পর পরই সুন্দরবনের মর্মান্তিক পরিস্থিতি বাইরের জগত জানতে পেরেছিল প্রচারমাধ্যমের সাহায্যে। সরকার ও তার প্রশাসনের নির্লজ্জ উদাসীনতার চেহারা খানিকটা হলেও রাজ্যের মানুষের কাছে নগ্নরূপে ধরা পড়েছিল। কিন্তু, লালগড়ে পুলিশি আক্রমণ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র প্রচারমাধ্যমই সেই প্রচারে এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছে যে, বিপন্ন সুন্দরবনবাসীর সংবাদ চাপা পড়ে গেছে। সরকারি ও বেসরকারি সহায়তাও দ্রুতগতিতে কমে যাচ্ছে।

ডায়েরিয়ার সঙ্গে কলেরার আক্রমণ পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর

অথচ, পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর হতে চলেছে বলে জানাচ্ছেন এলাকাগুলিতে কর্মরত ডাক্তার ও স্বেচ্ছাসেবকরা। ডায়েরিয়া ছড়িয়ে পড়ছিলই। এবার ক্রমাগত বেশি বেশি রোগীর শরীরে বিপজ্জনক কলেরার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। গোসাবার আক্রান্তদের অন্তত ৩০ শতাংশ কলেরায় ভুগছে এবং এই হার লাফিয়ে বাড়ছে। গোসাবায় ২৫টি মেডিক্যাল টীমের সাহায্যে ৯০টি চিকিৎসা শিবির পরিচালনা করেছে যে মেডিক্যাল সার্ভিস সেন্টার, তার সাধারণ সম্পাদক বিশ্বনাথ পাড়িয়া বললেন, ‘আমরা শুধু গোসাবাতেই অন্তত ৩০ জন রোগীর শরীরে কলেরার সুনির্দিষ্ট লক্ষণ পেয়েছি। অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করায় ভাল ফল হয়েছে এবং তারা এখন সুস্থ হওয়ার পথে।’ বললেন, ‘মেডিক্যাল সার্ভিস সেন্টার গোসাবা, বাসন্তী, কুলতলি, রায়দীঘি ও নামখানায় মেডিক্যাল ক্যাম্প করে যাদের চিকিৎসা করেছে, তাদের মধ্যে অন্তত ২০০ জনকে কলেরা রোগী হিসাবে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা গিয়েছে। এর বাইরে রয়েছে হাজার হাজার রোগী, যাদের কাছে আজও কোনও চিকিৎসা পৌঁছায়নি। যদি তাদের দ্রুত চিকিৎসা করা না হয়, তবে এই রোগ আরও ছড়িয়ে পড়বে এবং নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে।’ আরও বললেন, ‘পুকুর ও টিউবওয়েলগুলিকে এখনই পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করা দরকার। কিন্তু প্রশাসনের গতি অত্যন্ত ধীর। ফলে, পরিস্থিতি বিপজ্জনক।’

মশা ও ম্যালেরিয়ার আক্রমণ তীব্র

অধিকাংশ এলাকায় ঘূর্ণিঝড়ের এক মাস পরেও লোনাজল জমে আছে। তার ফলে ব্যাপক হারে বেড়েছে মশার উপদ্রব। মাথা তুলেছে ম্যালেরিয়ার আক্রমণ। কিন্তু ওষুধ মিলছে না। ছোট মোল্লাখালিতে এক ডাক্তার বললেন, ‘আমরা এখানে ডায়েরিয়া এবং কলেরার ওষুধ পাওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছি। সবটা পাচ্ছিও না। এখন আবার ম্যালেরিয়ার আক্রমণ চলছে। অবস্থা ভয়ঙ্কর।’

গোসাবায় চিকিৎসারত সরকারি ডাক্তাররাও স্বীকার করেছেন, রোগীদের মল-এর নমুনায় ম্যালেরিয়ার জীবাণু পাওয়া গেছে। অবশ্য তাঁদের মতে, পরিস্থিতি এখনও নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়নি। তবে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে না যাওয়া পর্যন্ত তাঁরা ও তাঁদের স্বাস্থ্য দফতর অপেক্ষা করবেন কি না, সে কথাটা অবশ্য বলেননি।

ঝড় বিধ্বস্ত গ্রামগুলির বাসিন্দাদের অনেকেই আজও গৃহহীন, অর্ধাহারী। যেমন, গোসাবা ব্লকের কুমিরমারিতে সুন্দরী নস্কর, পরিবারের ৭ জন সদসস্যের সঙ্গে ঝড়ের পর থেকে অস্থায়ী তাঁবুতে বাস করছে। অন্য বহু পরিবারের মতো এটিও টিকে আছে বেসরকারি সাহায্যের উপর। সরকারি সাহায্য বলতে পঞ্চায়েত থেকে গত মাসে তাদের জুটেছিল মাত্র ৬ কেজি চাল ও কিছুটা মসুর ডাল। সুন্দরী বললেন, ‘ঘূর্ণিঝড়ের পর থেকে খাবার জুটছে সামান্য। জলের সমস্যা মারাত্মক। তার ফলে, অনেকেই ডায়েরিয়ায় আক্রান্ত। এতদ্‌সত্ত্বেও কিছু মানুষ নদীবাঁধে কাজ করতে এসেছে। কারণ, কন্ট্রাক্টর টাকা দিলে খাবার কিনতে হবে।’

সরকারি-বেসরকারি ত্রাণ ও জল সরবরাহ দ্রুত কমছে

গ্রামের দুরবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য বললেন, ‘সরকারি সাহায্য প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য। যতটুকু বা পাচ্ছিলাম, এখন সেটাও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কাজের সন্ধানে অনেকে গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে। শিগ্‌গির আরও অনেকে যাবে।’

সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে পানীয়জল সরবরাহও দ্রুত কমে আসছে। লাহিড়িপুর পঞ্চায়েতের অ্যানপুরের বাসিন্দা মহাদেব দাস বললেন, ‘জল সরবরাহ প্রায় অর্দ্ধেক হয়ে গেছে। বহু মেডিক্যাল ক্যাম্পও বন্ধ হয়ে গেছে।’ গোসাবার একটি বেসরকারি সংগঠনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ‘আতঙ্কের বিষয়, জল সরবরাহ করা ভেসেলের সংখ্যা কমে গেছে। লালগড়ে পুলিশি অভিযান শুরু হওয়ার পর সুন্দরবনের প্রতি আর কেউ মনোযোগ দিচ্ছে না’। তাহলে মানুষের কী হবে? গোসাবার ৪৫০টি টিউবওয়েলের ৮০ শতাংশই তো দূষিত। কোনও টিউবওয়েলকেই জীবাণুমুক্ত করা হয়নি। পঞ্চায়েতগুলো স্বাস্থ্য দফতরের কর্তাদের কাছে সাহায্য চেয়েছে। ‘আমাদের লোকবল নেই, অর্থবলও নেই’ — জানিয়ে দিয়ে দায়িত্ব শেষ করেছেন ব্লক মেডিক্যাল অফিসার। প্রশাসনকে জানিয়ে মানুষগুলোকে বাঁচানোর কোনও উদ্যোগ গ্রহণের পথে না গিয়ে তিনি পরিষ্কার নিদান ঘোষণা করেছেন, ‘বর্তমান পরিস্থিতিতে পুকুরের লোনাজল ও টিউবওয়েলের দূষিত জল পান করা ছাড়া গ্রামবাসীদের বিকল্প পথ নেই।’ ফলে, মরুক মানুষ। তিনি বি এম ও’র চেয়ারে বসে সেই মর্মান্তিক দৃশ্যাবলী প্রাণভরে উপভোগ করবেন। যোগ্য সরকারের যোগ্য প্রশাসকই বটে!

অন্যদিকে, শাসকদলের নেতারা প্রশাসনের সঙ্গে ‘হরিহর আত্মা’। অফিসারদের সঙ্গে রফা করে ত্রাণের জিনিসপত্র কার্যত লুঠ করতেই তাঁরা মশগুল। কিন্তু ‘আয়লা দুর্গত জনগণের কমিটি’ প্রশাসনের এই অপদার্থ ভূমিকার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। জন্মলগ্ন ১৫ জুন থেকেই তারা প্রশাসনের উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করছে। তার ফলে কিছু কাজও হচ্ছে। গত ২১ জুনও তারা বিডিও অফিসে বিক্ষোভ দেখিয়েছে। তাদের বিক্ষোভের পর পানীয় জল সরবরাহে আবার খানিকটা গতি সঞ্চারিত হয়েছে।

এস ইউ সি আই নেতা কমরেড বিকাশ শাসমলের সঙ্গে কথা হচ্ছিল ২৭ জুন রাতে। তখন তিনি থানা থেকে বেরিয়েছেন একটি ত্রাণদলকে সঙ্গে নিয়ে। মৎস্যজীবী সংগঠনের সেই ত্রাণদলটির সঙ্গে রয়েছেন তাদের সভাপতি তথা কুলতলির এম এল এ কমরেড জয়কৃষ্ণ হালদার। তাঁরা আড়াই হাজার মশারি ও কিছু শাড়ি বিতরণ করতে এসেছেন লাহিড়িপুর, সাতজেলিয়া, রাঙ্গাবেলিয়া ও কুমিরমারির কিছু জায়গায়। কমরেড বিকাশ শাসমল তাঁদের সঙ্গে নিয়ে চলতে চলতে বললেন,

সাতের পাতায় দেখুন

এস ই জেড

কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে সারা দেশেই

বন্ধ হয়ে গেল শিল্পপতি মুকেশ আম্বানির প্রস্তাবিত ‘মুম্বাই এস ই জেড’ লিমিটেড। দীর্ঘ ২ বছর ধরে চেষ্টা করার পরেও প্রয়োজনীয় জমি সংগ্রহে ব্যর্থ হওয়ায় সুপ্রিম কোর্ট প্রকল্পটি বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে।

এদেশের বৃহত্তম এই বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল বা এস ই জেড গড়ে ওঠার কথা ছিল মহারাষ্ট্রের রায়গড়ে, ৪৫টি গ্রামের ১০ হাজার হেক্টরেরও বেশি পরিমাণ উর্বর কৃষিজমি নিয়ে। এর বিরুদ্ধে এলাকার কৃষিজীবী মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে গঠন করে ‘বিশেষ আর্থিক ক্ষেত্র হঠাও সংঘর্ষ সমিতি।’ তাদের প্রবল বাধায় এই বিপুল পরিমাণ জমি সংগ্রহে ব্যর্থ হয়েছে শিল্পপতি আম্বানির কোম্পানি।

স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, গোটা দেশেই যখন এস ই জেড গড়ে তোলার জন্য সরকারগুলি ওকালতি করছে এবং ইতিমধ্যেই ৫০০টি প্রকল্প সরকারি অনুমতি পেয়ে গেছে, তখন বিপুল সম্পদের অধিকারী একচেটিয়া পুঁজিপতি মুকেশ আম্বানির বিরুদ্ধে লড়বার শক্তি রায়গড়ের সাধারণ কৃষকরা পেল কোথা থেকে? বস্তুত, নন্দীগ্রামে সাধারণ কৃষিজীবী মানুষের অসাধারণ বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামই তাদের প্রেরণা জুগিয়েছে। এস ই জেড স্থাপনের বিরুদ্ধে নন্দীগ্রামবাসীর অসমসাহসিক সংগ্রাম গোটা দেশের সামনে এমন এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে যে, সরকারগুলিও এখন কৃষক আন্দোলনকে সমীহ করতে বাধ্য হচ্ছে। কৃষিজমি দখলে পুঁজিপতিদের ঢালাও অনুমতি দেওয়া কিংবা ১৮৯৪ সালের জমি অধিগ্রহণ আইনের জোরে চাষের জমি কেড়ে নেওয়ার আগে সরকারগুলিকে দু’বার ভেবে দেখতে হচ্ছে। কোথাও কোথাও পরিকল্পনা ত্যাগ করতেও হচ্ছে।

২০০৫ সালের জুন মাসে মুকেশ আম্বানিকে মুম্বাই বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার অনুমতি দেয় মহারাষ্ট্র সরকার। ২০০৭ সালে সরকার নিজেই আম্বানির জন্য কৃষিজমি দখলের কাজে নামে। কিন্তু প্রবল কৃষক বিক্ষোভের সামনে পড়ে ২০০৯ পর্যন্ত তারা প্রয়োজনীয় জমির ১০ শতাংশও অধিগ্রহণ করতে পারেনি। সরকার যাতে দ্রুত জমি অধিগ্রহণ করে দেয়, সেই নির্দেশ দিতে হাইকোর্টের কাছে অনুরোধ করে আম্বানির কোম্পানি। হাইকোর্ট এতে রাজি হয়নি। নন্দীগ্রাম আন্দোলনের ব্যাপকতা এবং গোটা দেশে তার প্রভাব দেখে আতঙ্কিত মহারাষ্ট্র সরকারও ঘোষণা করে যে তারা এস ই জেড প্রকল্পটির জন্য গায়ের জোরে কৃষিজমি দখল করবে না। এই পরিস্থিতিতে ৫ জুন সুপ্রিম কোর্ট মুম্বাই এস ই জেড প্রকল্পটিকে বাতিল ঘোষণা করতে বাধ্য হয়। ইতিপূর্বে কৃষক আন্দোলনের চাপে গোয়ার সরকার একইভাবে এস ই জেড প্রকল্প করবে না বলে ঘোষণা করেছিল।

গোটা দেশ জুড়েই এস ই জেড আজ এক বহু আলোচিত বিষয়। সকলেই জানেন, এস ই জেড হল দেশের মধ্যে এমন বিশেষ অঞ্চল, যেখানকার করব্যবস্থা ও আইন-কানুন গোটা দেশের চেয়ে আলাদা। এস ই জেড গঠন করার দ্বারা শিল্পবাণিজ্য তথা দেশের অর্থনীতির প্রভূত উন্নয়ন হবে, এ কথা বলে সরকারগুলি এস ই জেডের অন্তর্ভুক্ত কলকারখানা মালিকদের বিপুল করছাড় ও অন্য সুবিধা দেয়। দেশে প্রচলিত শ্রম আইন এখানে প্রযোজ্য নয় বলে এস ই জেডগুলিতে শ্রমিকদের দীর্ঘ আন্দোলনের দ্বারা অর্জিত অধিকারগুলিরও অস্তিত্ব থাকে না। এ হেন এস ই জেডের জন্য কৃষিজমি দখলের বিরুদ্ধে একদিকে যেমন অসংখ্য আন্দোলন গড়ে উঠছে, অন্যদিকে উন্নয়নের নতুন মডেল হিসাবে এস ই জেডকে তুলে ধরে জনমতকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থবাহী সরকার ও পেটোয়া অর্থনীতিবিদ-লেখকরা। এঁদের মতে, গায়ের জোরে জমি দখল করাটা খারাপ, কিন্তু উন্নয়নের মডেল হিসাবে এস ই জেড খুব ভাল; কৃষকদের সম্মতির ভিত্তিতে যদি কৃষিজমি অধিগ্রহণ করা হয় এবং ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে এস ই জেড দেশের অর্থনীতির বিপুল অগ্রগতি ঘটাবে। ব্যাপক হারে কর্মসংস্থান হবে। দেশে শিল্পায়ন ও উন্নয়নের বান ডেকে যাবে।

বিপুল সংখ্যক মানুষের স্বার্থ বিপন্ন করে মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিদের মুনাফা বৃদ্ধি করার বিরুদ্ধে গোটা দেশের যে সব শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ রয়েছেন, তাঁরা এস ই জেড-এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। এস ইউ সি আই-ও বিরাট এলাকা জুড়ে কৃষিজমি দখল করে এস ই জেড গঠনের বিরোধিতা করে আসছে গোড়া থেকেই। মার্কসবাদী বিচারপদ্ধতির আলোকে দেশের বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে এস ইউ সি আই দেখিয়েছে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বর্তমান চরম সংকটগ্রস্ত অবস্থায় একটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে ‘শিল্পায়ন’, অর্থাৎ লাগাতারভাবে নতুন নতুন কল-কারখানা গঠন ও ব্যাপক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সমর্থক মূলধারার অর্থনীতিবিদদের বক্তব্যের পাশাপাশি, এস ই জেডের প্রবক্তাদের কণ্ঠ ছাপিয়ে অপর একদল অর্থনীতিবিদের গলাও শোনা যাচ্ছে, যাঁরা অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিল্পায়নের এই নতুন মডেলের কার্যকারিতা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন, যদিও প্রধান বা বড় বড় মিডিয়ায় এঁদের বক্তব্য প্রচার পায় না। এই অর্থনীতিবিদরা দেশের উন্নয়ন বলতে শুধুমাত্র পুঁজিমালিকদের মুনাফার ভাণ্ডার স্ফীত হওয়াকে বোঝেন না, বোঝেন, দেশের আপামর জনসাধারণের রুটি-রুজি জোগাড়ের ব্যবস্থা এবং শিক্ষা-স্বাস্থ্য-বাসস্থানের নিশ্চয়তাকে। মূলধারার সংবাদমাধ্যমে এই সমস্ত অর্থনীতিবিদদের বক্তব্য বিশেষ প্রকাশিত না হলেও গোটা দেশজুড়েই নানা সেমিনার ও আলোচনাসভায় এঁরা নিজেদের মতপ্রকাশ করছেন, তর্ক-বিতর্ক চলছে। গত সেপ্টেম্বরে শিমলার ‘ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ অ্যাডভান্সড স্টাডি’তে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এ’রকমই একটি আলোচনা সভা। বিষয় ছিল, ‘আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল।’ গোটা দেশের বিভিন্ন অংশের অর্থনীতিবিদ, গবেষকরা যোগ দিয়েছিলেন এই সভায়। তাঁদের বক্তব্যে এস ই জেড সম্পর্কে বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে এসেছে।

২০০৫ সালে বিজেপি পরিচালিত এন ডি এ সরকার প্রথম খসড়া এস ই জেড আইন তৈরি করে। পরে কংগ্রেস পরিচালিত ইউ পি এ সরকার সেই আইন পাশ করে। এস ই জেডে শিল্পপতিদের অতি সস্তায় জমি, বিদ্যুৎ, জল পাইয়ে দেওয়া সহ বিপুল ট্যাক্সছাড় ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দেওয়ার বিনিময়ে, এই সরকারগুলি বলেছিল, এস ই জেড গঠিত হলে শুধু পণ্য ও পরিষেবার রপ্তানি বাড়বে তাই নয়, ব্যাপক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সৃষ্টি হবে, বিপুল পরিমাণ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে এবং দেশজুড়ে উন্নয়নের উপযোগী পরিকাঠামো গড়ে উঠবে। এক কথায় এস ই জেডগুলি ‘উন্নয়নের ইঞ্জিন’ হিসাবে কাজ করবে। সরকার ও এস ই জেডের প্রবক্তাদের এইসব প্রতিশ্রুতির কোনটিই পূরণ হয়নি। তথ্য তুলে ধরে আলোচকরা দেখিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত যে এস ই জেডগুলি গড়ে উঠেছে, সেগুলিতে প্রধানত তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রান্ত কাজকর্ম চলে এবং এগুলি গড়ে উঠেছে মূলত দিল্লি, মুম্বাই, হায়দ্রাবাদের মতো বড় বড় শহরের আশেপাশে। ফলে এস ই জেডগুলি গঠিত হওয়া সত্ত্বেও গোটা দেশ জুড়ে পণ্য ও পরিষেবার উৎপাদন ও চলাচল যেমন বৃদ্ধি পায়নি, তেমনই পরিকাঠামো তৈরির ক্ষেত্রেও কোনও অগ্রগতি ঘটেনি। যা ঘটেছে তা হল, ধনী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে আয়বৈষম্যের বিপুল বৃদ্ধি। অর্থনীতিবিদদের আশঙ্কা, এস ই জেডগুলি শুধু মানুষে মানুষে আয়বৈষম্য সৃষ্টি করবে তাই নয়, বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যেও আয়ের বিরাট পার্থক্য সৃষ্টি হবে; কৃষি উৎপাদন ব্যাপক কমে যাওয়ার সাথে সাথে বিঘ্নিত হবে সামাজিক নিরাপত্তাও।

এস ই জেড গঠনের জন্য রাজ্যে বিনিয়োগ টেনে আনতে পুঁজিপতিদের পেটোয়া রাজ্য সরকারগুলি কীভাবে পুঁজিপতিদের মতোই একে অপরের বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর প্রতিযোগিতা শুরু করেছে, আলোচকরা তা দেখিয়েছেন। কে কত সস্তায় এস ই জেডের মালিকদের হাতে জমি তুলে দিতে পারে, কে কত বিপুল হারে তাদের ট্যাক্সছাড় ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা করে দিতে পারে, ইত্যাদি নিয়ে তীব্র প্রতিযোগিতা চালাচ্ছে বিভিন্ন রাজ্য সরকার। এর ফলে সরকারি রাজস্বের বিপুল ঘাটতি হচ্ছে এবং এই ঘাটতিরই দোহাই দিয়ে জনকল্যাণমূলক কাজকর্ম থেকে ক্রমেই হাত গুটিয়ে নিচ্ছে সরকার। এর ফল ভুগতে হচ্ছে অসংখ্য মেহনতি সাধারণ মানুষকে। শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদির মতো অতি প্রয়োজনীয় যে পরিষেবাগুলি এতদিন সরকারি ভর্তুকির জন্য দরিদ্র নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের অন্তত কিছুটা নাগালের মধ্যে ছিল, পুঁজিপতিদের থলিতে টাকা ঢালতে গিয়ে, সেগুলিকে সরকার এখন চড়া দামে বেচার ব্যবস্থা করেছে। অথচ, দেশজোড়া বেকার সমস্যার কারণে পয়সা দিয়ে এসব কেনার ক্ষমতা দিন দিন কমে যাচ্ছে সাধারণ মানুষের। অর্থনীতিবিদরা তথ্য দিয়ে দেখিয়েছেন, এস ই জেডগুলিতে যে অল্প কিছু শিল্প গড়ে উঠবে, পুঁজিনিবিড় হওয়ার কারণে সেখানেও কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে নামমাত্র। তাঁরা দেখিয়েছেন, বাস্তবে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সুষম উন্নয়ন ঘটাতে, কিংবা অদক্ষ শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতেও এস ই জেডগুলি ব্যর্থ হয়েছে।

বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের প্রাসঙ্গিকতা নিয়েই একটি মৌলিক প্রশ্ন তোলা হয়েছে। বক্তারা বলেছেন, এস ই জেড নিয়ে মাতামাতি করার আগে নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার, এগুলি অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি আদৌ বৃদ্ধি করতে সক্ষম কিনা। যদি সক্ষম না হয়, তাহলে এস ই জেড-কে ‘উন্নয়নের ইঞ্জিন’ বলা হবে কেন? আর যদি দেখা যায়, এস ই জেডগুলি অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাতে পারে, তাহলে এস ই জেডগুলিকে কয়েকটি নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হচ্ছে কেন? গোটা দেশের সমগ্র অর্থনীতিকেই যদি এস ই জেড হিসাবে গড়ে তোলা হয়, তবে তো গোটা দেশেরই উন্নয়ন ঘটতে পারে। সেটা করা হচ্ছে না কেন?

এস ই জেড নিয়ে আলোচনায় বারবারই জমি অধিগ্রহণের বিষয়টি উঠে আসছে। গোটা দেশে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই জমি সংগ্রহ করা হয় কৃষিজীবীদের উৎখাত করে। এবং তথ্য বলছে, প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই, এর প্রবল বিরোধিতা করছে কৃষিজীবী সহ এলাকার সাধারণ মানুষ। আলোচকরা দেখিয়েছেন, জমি অধিগ্রহণের বদলে কৃষকদের পুনর্বাসন দেওয়া দূরস্থান, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাদের যথাযথ ক্ষতিপূরণটুকুও দেওয়া হয় না। বস্তুত এস ই জেডগুলির সঙ্গে জড়িয়ে আছে ক্ষতিপূরণ, পুনর্বাসন ও কর্মসংস্থানের মিথ্যা প্রতিশ্রুতির বন্যা। এগুলিতে এ পর্যন্ত যতজনের কর্মসংস্থান হয়েছে, কাজ হারিয়েছে তার অনেকগুণ বেশি মানুষ। কৃষিজমি থেকে উচ্ছেদ হওয়া এই মানুষগুলির ঠাঁই হয়েছে ফুটপাতে, জীবিকা হয়েছে ভিক্ষাবৃত্তি।

এস ইউ সি আই-এর বক্তব্যেরই প্রতিধ্বনি কার্যত শোনা যাচ্ছে এস ই জেড বিরোধী অর্থনীতিবিদদের আলোচনায়। তাঁরাও বলছেন, এস ই জেড গড়ে তুলে অমূল্য প্রাকৃতিক সম্পদগুলি পুঁজিপতিদের দখলে নিয়ে আসার চেষ্টা চালাচ্ছে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি। এ প্রসঙ্গে জলসম্পদের বিষয়টিকে খুবই গুরুত্ব দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের আশঙ্কা, প্রয়োজনীয় জল দখলের জন্য এস ই জেডের মালিকরা যেভাবে প্রতিযোগিতায় মেতেছে, তাতে শীঘ্রই জল একটি বিক্রয়যোগ্য পণ্যে পরিণত হবে এবং ক্রমে সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাবে। একই সাথে, এস ই জেডের জন্য ঢালাও কৃষিজমি দখলের ফলে দেশের খাদ্য নিরাপত্তাও বিপন্ন হবে বলে গবেষকরা মতপ্রকাশ করেছেন।

পুঁজিবাদী অর্থনীতির শ্রেষ্ঠত্ব যাঁরা প্রচার করেন, এস ই জেড-এর সেই সব প্রবক্তারা ভর্তুকি ব্যবস্থার ঘোরতর বিরোধী। সমাজের দরিদ্রতম মানুষকেও কোনওরকম সরকারি ভর্তুকি দিতে তাঁরা নারাজ। অথচ পুঁজিপতিদের ভর্তুকি দেওয়ার জন্য এঁদেরই আবার জোর গলায় সওয়াল করতে শোনা যায়। এস ই জেডের মালিকদের সস্তায় জমি, জল, বিদ্যুৎ, ট্যাক্স সহ অন্যান্য ছাড় পাইয়ে দিতে সরকারকে এঁরাই পরামর্শ দেন; বাস্তবে যা পুঁজিপতিদের জন্য সরকারি ভর্তুকি ছাড়া কিছুই নয়। বিরোধী অর্থনীতিবিদরা বলেছেন, এস ই জেডের মালিকদের এইভাবে নানা সুবিধার নামে সরকারি ভর্তুকি দেওয়ার বদলে সরাসরি অর্থসাহায্য দেওয়া হোক। তাহলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে, সাধারণ মানুষের রক্ত জল করা পরিশ্রমের টাকা, কী পরিমাণে এইসব পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দিচ্ছে তাদের ধামাধরা সরকারগুলি। বস্তুত, এস ই জেডগুলি সম্পদের পুনর্বণ্টনের একটি নতুন উপায় ছাড়া অন্য কিছু নয়। শিল্পপতিদের মুনাফার ভাণ্ডার আরও ভরিয়ে তোলার জন্য এস ই জেড গঠন করতে গিয়ে যে মানুষগুলিকে জীবন-জীবিকা থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে, অর্থনৈতিক সম্পদ তাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে তুলে দেওয়া হচ্ছে এস ই জেডের মালিক পুঁজিপতিদের হাতে, সাথে সাথে গোটা দেশের খেটে খাওয়া মানুষকে শোষণ করে মালিকদের পেট ভরাবার ব্যবস্থা করছে সরকার।

শুধু নির্মম শোষণ চালানোই নয়, এস ই জেড বহু ক্ষেত্রে এমনকী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মূল নীতিগুলিকেও লংঘন করে বলে মতপ্রকাশ করেছেন অর্থনীতিবিদরা। তাঁরা বলছেন, এদেশের প্রতিটি নাগরিকের বেঁচে থাকা ও স্বাধীনতার যে মৌলিক অধিকারের কথা বলা হয়েছে ভারতের সংবিধানে, এস ই জেড গঠনের জন্য লক্ষ লক্ষ কৃষিজীবী মানুষকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে জীবিকা থেকে উচ্ছেদ করে সেই মৌলিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে।

এস ই জেড আইন ২০০৫ অনুযায়ী, এই বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলিকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত সরকারের আওতার বাইরে রাখার বন্দোবস্ত হয়েছে। অথচ, দ্বিতীয় অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্মস্‌ কমিশন’-এর ষষ্ঠ রিপোর্টে স্পষ্ট বলা আছে যে, দেশের অভ্যন্তরের কোনও অংশই সংবিধানসম্মতভাবে নির্বাচিত সরকারের এক্তিয়ারের বাইরে থাকতে পারে না। ফলে এস ই জেডগুলিও স্থানীয় প্রশাসনের আইন-কানুন মেনে চলতে বাধ্য। এতদ্‌সত্ত্বেও এস ই জেডগুলিতে স্থানীয় পৌর প্রশাসনের কোনও নিয়ন্ত্রণই থাকছে না। তাই সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন উঠেছে, তাহলে এদেশের এস ই জেডগুলি কি ভারতীয় সংবিধানের আওতার মধ্যে পড়ে না? তাছাড়া, অর্থনীতিবিদরা এ অভিযোগও তুলছেন যে, গোটা দেশে আইনের যে কাঠামোটি প্রচলিত

আটের পাতায় দেখুন

লালগড়ে যৌথ অভিযান কংগ্রেস-সিপিএমের গভীর বন্ধুত্বেরই প্রমাণ

একের পাতার পর

বিক্ষোভের আকারে তা ফেটেও পড়তে থাকে। সিপিএম সরকার মাওবাদী নাম দিয়ে মানুষের এই স্বতস্ফূর্ত বিক্ষোভ-প্রতিবাদকে পুলিস দিয়ে দমন করতে শুরু করে। গ্রামে গ্রামে পুলিস ক্যাম্প বসিয়ে দেওয়া হয়। পুলিসের কাজ হয়, যারাই পুলিস ও সিপিএম নেতাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করছে, তাদের মাওবাদী তকমা লাগিয়ে মারধর করা, ধরপাকড় চালানো, বিনা বিচারে আটকে রাখা, জামিন অযোগ্য ধারায় গ্রেফতার করা, ঘরে ঘরে ঢুকে মহিলাদের শ্লীলতাহানি করা, হাঁস-মুরগি, খাদ্যদ্রব্য লুঠ করা। সিপিএম ও পুলিসি অত্যাচারের বিরুদ্ধে এইভাবে মানুষের মনে বিক্ষোভের আগুন জ্বলছিলই। তা বিস্ফোরণের আকারে ফেটে পড়ল যখন গত বছর ২ নভেম্বর শালবনীতে জিন্দালদের কারখানার শিলান্যাস করে মুখ্যমন্ত্রীর ফেরার পথে ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণের পর পুলিসি অত্যাচার অতীতের সমস্ত সীমা ছাড়িয়ে গেল। পুলিস স্কুলের ছাত্র, নিরীহ মহিলা, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক— কাউকেই রেহাই দেয়নি। লাথি মেরে গর্ভবতী নারীর পেটের সন্তানকে নষ্ট করে দিয়েছে, বন্দুকে কুঁদোর আঘাতে অন্ধ হয়ে গেছেন আর এক নারী, গ্রেফতার করেছে নির্বিচারে। এটা বিস্ময়কর যে, এই বিস্ফোরণ কারা ঘটাল, তাব রহস্য আজও উন্মোচিত হল না, অথচ তাকে অজুহাত করে পুলিসি অত্যাচার চলতেই থাকল।

পুলিসের এই ভয়াবহ অত্যাচারে জঙ্গলমহলের আপাত শান্ত মানুষগুলির ধৈর্যের বাঁধ যেন ভেঙে যায়। প্রতিবাদে প্রতিরোধে জেগে ওঠে গোটা জঙ্গলমহল। প্রথম দিকে আন্দোলনের নেতৃত্ব ছিল আদিবাসীদের প্রাচীন মাঝি মাড়োয়া সংগঠনের হাতে। কিন্তু সিপিএম নেতারা এই সংগঠনের স্বার্থান্বেষী কিছু লোককে কব্জা করে আন্দোলন প্রত্যাহার করানোর কৌশল নেয়। নেতৃত্বের একাংশের এই বিশ্বাসঘাতকতায় ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে আন্দোলনে যুক্ত হাজার হাজার সাধারণ মানুষ। তখন, কোনও রাজনৈতিক দল নয়, এই জনগণই গড়ে তোলে আন্দোলনের নিজস্ব হাতিয়ার 'পুলিসি সন্ত্রাসবিরোধী জনসাধারণের কমিটি'। কমিটি পুলিসি আক্রমণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর পাশাপাশি ঘোষণা করে, অবিলম্বে সরকারকে তাঁদের বাঁচার দাবিগুলি মেটাতে হবে, বিনা বিচারে আটক ও মিথ্যা মামলায় গ্রেফতার করা সকলকে মুক্তি দিতে হবে এবং নিরীহ মানুষের উপর অকথ্য অত্যাচারের জন্য, মহিলাদের শ্লীলতাহানির জন্য পুলিসকে ক্ষমা চাইতে হবে। না হলে পুলিসকে বয়কট করা হবে। এই পরিস্থিতিতে তথাকথিত বৃহৎ এবং সরকারি দলগুলি নীরব থাকলেও দরিদ্র মানুষের বাঁচার এই লড়াইয়ে সামিল হয় এস ইউ সি আই। আন্দোলনের বার্তা রাজ্যব্যাপী ছড়িয়ে দিতে এবং আন্দোলনের সপক্ষে জনমত সংগঠিত করতে গত বছর ১৫ নভেম্বর ঝাড়গ্রাম মহকুমা ও পাশ্ববর্তী এলাকায় বনধের ডাক দেয় এস ইউ সি আই। এই আন্দোলনের সমর্থনে ডাকা এই প্রথম বনধ অভূতপূর্বভাবে সফল হয়। সারা রাজ্যে জেলাশাসক দপ্তরগুলিতে বিক্ষোভ ও ব্যাপক প্রচার অভিযান চালিয়ে আন্দোলনের পক্ষে জনমত গঠনের কর্মসূচি গ্রহণ করে এস ইউ সি আই। ৪ জানুয়ারি জনসাধারণের কমিটির ডাকা বনধকে সর্বশক্তি দিয়ে সমর্থন করে এস ইউ সি আই। ২২ জানুয়ারি বিভিন্ন দাবিতে এস ইউ সি আই যে বাংলা বনধের ডাক দেয় তারও অন্যতম দাবি ছিল লালগড় সমস্যার সমাধান। ৪ ফেব্রুয়ারি এস ইউ সি আই পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া জেলায় বনধের ডাক দেয় এবং তা সর্বাত্মক সফল হয়। রাজ্যপালের হস্তক্ষেপ চেয়ে দাবিপত্র পেশ করেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ। ৯ মার্চ এস ইউ সি আইয়ের কৃষক সংগঠন এ আই কে কে এম এস 'দাবি মানো, না হয় গুলি করো' ঘোষণা করে কলকাতায় লাগাতার অবস্থানের ডাক দেয়। পুলিশ শেষমুহূর্তে অত্যন্ত অন্যায়ভাবে এই কর্মসূচির অনুমতি বাতিল করে দেয়। প্রতিবাদে সেদিন হাজার হাজার মানুষের বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত হয়। এই কর্মসূচিরও অন্যতম দাবি ছিল লালগড় সমস্যার সমাধান। জনসাধারণের কমিটি ২৪ এপ্রিল কলকাতায় যে মিছিল ও সমাবেশ করে, তাতে দলের রাজ্য নেতৃত্ব অংশ নেয়। সামগ্রিকভাবে এই আন্দোলনগুলিতে এস ইউ সি আই-এর অংশগ্রহণ ও বনধগুলির সাফল্য জঙ্গলমহলের আন্দোলনকে শক্তিশালী ও বিস্তৃত হতে সাহায্য করে।

আন্দোলন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার প্রত্যন্ত জঙ্গলমহল ঝাড়গ্রাম, গোপীবল্লভপুর, বিনপুর, সাঁকরাইল, কেশিয়াড়ী, খড়গপুর (লোকাল), মেদিনীপুর, শালবনী, গোয়লতোড়, গড়বেতা প্রভৃতি থানা সহ বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম জেলা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে যায়। সর্বত্রই কমিটির শাখা গড়ে উঠতে থাকে এবং ভলান্টিয়ার বাহিনী তৈরি হয়। এস ইউ সি আই-এর স্থানীয় কর্মীরা এই প্রচেষ্টায় সামিল হয়। আন্দোলনের এই সমগ্র পর্যায়ে জনগণের কমিটিই আন্দোলন পরিচালনা করেছে, এলাকায় কিছু বিচ্ছিন্ন মাওবাদী গ্রুপ থাকলেও আন্দোলনের সঙ্গে তাদের কোনও প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না। তা ছাড়া সকলেই জানেন, 'মাওবাদীরা' এভাবে জনগণের কমিটি করে প্রকাশ্যে হাজার হাজার মানুষকে নিয়ে গণতান্ত্রিক দাবির ভিত্তিতে ভারতের কোথাও আন্দোলন করে না। তারা বিচ্ছিন্নভাবে কখনও ব্যক্তিহত্যা ও বিস্ফোরণ ঘটায়, যার সাথে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের মহান নেতা মাও সে তুঙের চিন্তাধারার কোনও সম্পর্কই নেই। তিনি পৃথিবীর বৃহত্তম জনসংখ্যার দেশ চীনের কোটি কোটি শোষিত মানুষকে মার্কসবাদী বিপ্লবী মতবাদে অনুপ্রাণিত করে লক্ষ লক্ষ বিপ্লবী সৈনিককে নিয়ে মুক্তি বাহিনী গঠন করে দুর্ধর্ষ মার্কিন-জাপান সাম্রাজ্যবাদ-সামন্ততন্ত্র-চিয়াং চক্রকে পরাস্ত করে বিপ্লব সফল করে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন। আমরা মাওবাদীদের এই ধরনের কার্যকলাপকে সমর্থন করি না। আমরা মাওবাদী দলকে নিষিদ্ধ করার বিরুদ্ধে এবং বিনা বিচারে ও মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে মাওবাদী ও অন্য রাজনৈতিক দলের কর্মীদের কারারুদ্ধ করারও বিরুদ্ধে। তবুও এটা দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, এ দেশে আগে নকশালপন্থী ও বর্তমানে মাওবাদী বলে যাঁরা পরিচিত, তাঁদের মধ্যে কিছু সৎ, আবেগপ্রবণ মানুষ থাকলেও তাঁরা কখনওই মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও মাও সে তুঙের চিন্তাধারাকে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারেননি। তা না পারার ফলে বাস্তবে বিপথগামী হয়ে নিজেদের অজ্ঞাতসারেই তাঁরা শোষকশ্রেণী ও বুর্জোয়া রাষ্ট্র কর্তৃক গণআন্দোলন ও বিপ্লবী সংগ্রাম বিনষ্ট করার হাতিয়ার হিসাবেই ব্যবহৃত হচ্ছেন।

বুর্জোয়া রাষ্ট্র, সরকার এবং সংবাদমাধ্যমগুলি এদের ঢালাও প্রচার দেয় (যেটা কোনও দেশেই যথার্থ বিপ্লবীদের বুর্জোয়াশ্রেণী দেয় না, চীনেও মাও সে তুঙের নেতৃত্বে পরিচালিত মুক্তিসংগ্রামকে দেয়নি) এই হীন উদ্দেশ্যে যে, বিপ্লবের আবেগসর্বস্ব অপরিণত যুবক-যুবতীরা যাতে এই দিকে আকৃষ্ট হয়ে অকালে প্রাণ ঝরায় এবং বাকিদের মধ্যে হতাশা সৃষ্টি হয়। পাশাপাশি কিছু বিক্ষিপ্ত ব্যক্তি হত্যা ও বিস্ফোরণের ঘটনাকে দেখিয়ে মহান মাও সে তুঙের চিন্তাধারা তথা মার্কসবাদের ভাবমূর্তিকে ক্ষুন্ন করার অপচেষ্টা চালায়। কোথাও কোথাও বুর্জোয়া রাষ্ট্র, মালিকশ্রেণী এবং বুর্জোয়া সরকার জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নিজেরাই সুপরিকল্পিতভাবে বিস্ফোরণ ও হত্যাকাণ্ড ঘটায় এবং সেটাকে মাওবাদীদের কার্যকলাপ বলে প্রচার করে। এমনকী এও শোনা যায় যে, সিপিএম নেতৃত্বও কেশপুর ও গড়বেতায় তৃণমূল কংগ্রেসকে 'উৎখাত' করার অভিযানে মাওবাদীদের কোনও গোষ্ঠীকে অস্ত্র জুগিয়ে ব্যবহার করেছিল।

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, লালগড় আন্দোলনের জনসাধারণের কমিটি আন্দোলনের দাবিগুলি সব সময় আলাপ আলোচনার পথেই মেটাতে চেয়েছে। কমিটির নেতা ছত্রধর মাহাতোর সঙ্গে প্রশাসনের অনেকবার বৈঠক হয়েছে। এমনকী গত ১৩ জুন মেদিনীপুর সার্কিট হাউসে জনসাধারণের কমিটির সঙ্গে স্বরাষ্ট্র সচিব অর্ধেন্দু সেনের বৈঠক হয়। সেখানে ছত্রধর মাহাতো স্বরাষ্ট্র সচিবকে অবরোধ তোলার চার দফা শর্তও দেন। আলোচনায় উভয়পক্ষ সন্তোষ প্রকাশ করেন। পরবর্তী আলোচনার দিন ঠিক হয় ১৪ জুলাই। এই পর্যন্ত কখনও প্রশাসন ছত্রধর মাহাতোকে 'মাওবাদী' বা মাওবাদীদের প্রশ্রয়দাতা বলে বর্ণনা করেনি। ১৩ জুনের পর হঠাৎই তারা আবিষ্কার করল ছত্রধর মাহাতো মাওবাদী এবং মাওবাদীরাই লালগড়ের দখল নিয়ে বসেছে। তা হলে হঠাৎ কী এমন ঘটল, যাতে পরিস্থিতির সম্পূর্ণ বদল ঘটে গেল? সরকার এবং সরকার অনুগৃহীত সংবাদমাধ্যমগুলি 'মাওবাদী সন্ত্রাস' এবং 'লালগড় অবরুদ্ধ' বলে সমস্বরে প্রচার করতে শুরু করে দিল? এবং সরকারও ঘোষণা করে দিল যে, সেনা অভিযান ছাড়া জঙ্গলমহলকে মাওবাদ সন্ত্রাসমুক্ত করা যাবে না?

আলোচনার পরবর্তী দিন ধার্য করার পর আচমকা সব আলোচনার দরজা বন্ধ করে দিয়ে এইসব ঘোষণা এবং সামরিক অভিযান আপাতদৃষ্টিতে বিস্ময়কর এবং আকস্মিক মনে হলেও এর নেপথ্যে কাজ করেছে রাজ্যের সিপিএম সরকার ও কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারের এক গভীর ষড়যন্ত্র। তাদের মাথায় এই চিন্তা এল যে, লালগড়ের আন্দোলনের দাবি মেনে যদি মীমাংসা করা হয়, তা হলে আন্দোলনের এই সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে ভবিষ্যতে এই অঞ্চলে এবং ভারতের অন্যত্র অরণ্যের আদিবাসী এবং গরিব মানুষেরা নিজেদের দাবি আদায়ের জন্য আরও ব্যাপক আন্দোলনের পথে যাবে। অথচ আদিবাসী অধ্যুষিত এই অরণ্য ও পার্বত্য অঞ্চলেই রয়েছে বিপুল খনিজ ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ, যেগুলি তারা একের পর এক দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের হাতে শোষণ-লুণ্ঠনের জন্য তুলে দিচ্ছে। এবং এ কাজে সর্বত্রই তারা প্রতিরোধ আন্দোলনের সম্মুখীন হচ্ছে। ফলে এই আন্দোলনকে মাওবাদী তকমা লাগিয়ে যেভাবে হোক পর্যুদস্ত করতে হবে, যাতে বর্তমানে ও ভবিষ্যতে এখানে ও অন্যত্র কোথাও আদিবাসী ও গরিব মানুষরা মাথা তুলতে সাহস না পায়। এটাও লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যেকোনও গণবিক্ষোভ ও আন্দোলনকে সারা দেশে এবং এ রাজ্যেও মাওবাদী আখ্যা দিয়ে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার দমন-পীড়নের পথ নিচ্ছে। মাওবাদী বিপদের জুজু দেখাতে সংবাদপত্রে ব্যাপক প্রচারও তোলা হচ্ছে। এই জুজু দেখিয়েই প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর এবং গণআন্দোলন রোধ করার জন্য একের পর এক অগণতান্ত্রিক আইন পাশ করিয়ে নেওয়া হচ্ছে। নন্দীগ্রাম আন্দোলনকে মাওবাদী আখ্যা দিয়েও রাজ্য সরকার সফল হতে পারেনি। সেজন্য লালগড়ের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা করে আগের থেকেই খবরের কাগজে ছবি ছাপিয়ে ও ব্যাপক প্রচারের বন্দোবস্ত করে জনমতকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছে।

দ্বিতীয়ত, নন্দীগ্রাম সংলগ্ন খেজুরির জনগণ স্বতস্ফূর্তভাবে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে সিপিএম অফিস ও নেতাদের বাড়ির থেকে বহু অস্ত্র উদ্ধার করেছে। যা দেখে রাজ্যবাসী শিউরে উঠেছে, সিপিএম নেতাদের প্রতি ঘৃণায় ও ধিক্কারে ফেটে পড়েছে। এই অবস্থায় এই ঘটনা এবং অন্যত্রও সিপিএম কর্তৃক ব্যাপক সন্ত্রাস সৃষ্টির সংবাদ থেকে মানুষের দৃষ্টিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার হীন উদ্দেশ্যে লালগড়ে এই তথাকথিত মাওবাদীদের বিরুদ্ধে অভিযানকে সংবাদ মাধ্যমের শিরোনামে নিয়ে আসার পরিকল্পনাও কাজ করেছে।

তৃতীয়ত, শুধু লালগড়ে নয়, সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনেও 'মাওবাদীদের ভূমিকা ছিল' এবং সিপিএমের বিরুদ্ধে একটা 'গভীর ষড়যন্ত্র' হিসাবেই এই আন্দোলনগুলি গড়ে উঠেছে, এ কথা এ রাজ্যে এবং জাতীয় স্তরে ছড়িয়ে দিয়ে সিপিএম যে কত 'আক্রান্ত' এটা 'প্রমাণ' করা এবং লোকসভা নির্বাচনের বিপর্যয়ের গ্লানি থেকে মুখ রক্ষার চেষ্টা করাও এই সামরিক অভিযানের পিছনকার আর একটা উদ্দেশ্য।

চতুর্থত, দীর্ঘদিন ধরে সিপিএম ও কংগ্রেসের মধ্যে যে গভীর বন্ধুত্ব চলছিল, সেটা লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে এবং অব্যবহিত পরে কিছুটা চিড় খেলেও পুনরায় তাকে মেরামত করার চেষ্টা শুরু হয়েছে এই যৌথ অভিযানের মাধ্যমে।

পঞ্চমত, এই সামরিক অভিযান চালানো এবং তার বিপুল 'সাফল্য' দেখিয়ে লোকসভা ভোটে পর্যুদস্ত হত্যোদম দলীয় কর্মীদের খানিকটা চাঙ্গা করার চেষ্টা করছে সিপিএম নেতৃত্ব। সর্বোপরি লালগড়ের প্রবল গণআন্দোলনের চাপে ও জনরোষে যে অত্যাচারী ও লুণ্ঠনকারী সিপিএম নেতা-কর্মীরা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল, এই যৌথ সামরিক অভিযানের দ্বারা এলাকা 'পুনর্দখল' করে, অত্যাচারী সেইসব সিপিএম নেতা-কর্মীদের ফিরিয়ে আনাও নেতৃত্বের আর একটি উদ্দেশ্য।

এই যৌথ সামরিক অভিযানের ঘটনা পুনরায় দেখিয়ে দিল, ভোটের প্রশ্নে সিপিএম ও কংগ্রেসের মধ্যে সাময়িক দ্বন্দ্ব-সংঘাত যা-ই ঘটুক, গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে নির্মমভাবে দমন করার এমনকী সশস্ত্র সামরিক বাহিনী দিয়ে জনগণের প্রতিবাদী কণ্ঠকে রোধ করার প্রয়োজনে এদের ঐক্যবদ্ধ হতে, যৌথ অভিযান চালাতে এতটুকু আটকায় না, এক সুরে 'মাওবাদী' ধুয়া তুলতেও অসুবিধা হয় না। অর্থাৎ দুই দলই প্রয়োজনে যেকোনও মুহূর্তে দেশি-বিদেশি পুঁজির স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা নেয়।

শুধু তাই নয়, সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের গণআন্দোলনে এ রাজ্যের বুদ্ধিজীবী ও বিশিষ্ট

আটের পাতায় দেখুন

সেনা অভিযান বন্ধের দাবিতে আলিপুর জেলে অনশন

লালগড়ে মাওবাদী ধরার ধুয়া তুলে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যৌথ সামরিক অভিযান অবিলম্বে বন্ধ করে অত্যাচারিত বঞ্চিত আদিবাসী জনগণের গণতান্ত্রিক দাবিগুলি মেনে নেওয়ার দাবিতে গত ২৪ জুন আলিপুর কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে ৯২ জন রাজনৈতিক বন্দি অনশন করেছেন।

এস ইউ সি আই নেতা কমরেড প্রবোধ পুরকাইতের নেতৃত্বে ৮৮ জন বন্দি এক স্বাক্ষরিত আবেদনে জেল সুপারকে অনশন কর্মসূচির কথা জানান। পরে আরও ৪ জন বন্দি আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করেন ও অনশনে অংশ নেন। ২৪ জুন সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত অনশন চলে। দুপুরে বন্দিদের খাবার দেওয়া হলেও কেউ তা স্পর্শ করেননি। রাতে কর্তৃপক্ষ সেই খাবার ফেরৎ নিয়ে যায়। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সমর্থনে রাজনৈতিক বন্দিদের এই অনশন জেলের অন্যান্য বন্দিদের উপরও গভীর প্রভাব ফেলেছে।

আমেরিকা ঃ প্রকৃত চিত্র

প্রচার মাধ্যমের কল্যাণে বহু মানুষের মনেই এক বদ্ধমূল ধারণা ছিল, আমেরিকা হল এক স্বপ্নের রাজ্য। অভাব, দারিদ্র, বেকারি বা জীবনের যে হাজারটা সমস্যায় এদেশের অধিকাংশ মানুষের প্রতিদিন ওষ্ঠাগত প্রাণ, ওদেশের মাটিতে তা নাকি নিতান্তই এক অপরিচিত দৃশ্য। তা এহেন স্বপ্নরাজ্যের বাস্তব চিত্রটা কী দেখা যাচ্ছে?

গত বছরের অর্থনৈতিক মহামন্দায় লেম্যান ব্রাদার্স সহ বেশ কিছু বাঘা বাঘা অর্থনৈতিক ও বহুজাতিক সংস্থার দেউলিয়া হবার কথা ঘোষণা হওয়ার সাথে সাথেই সেদেশের অর্থনীতির ঐ ঝাঁ চকচকে পালিশ খসে পড়ে ভিতরের খড়-বাঁশের অতি সাধারণ কাঠামোটা চোখের সামনে এসে পড়ে। প্রতিটি বৃহৎ ও ক্ষুদ্র সংস্থা যেমন একদিকে নিজেদের বাঁচাতে দ্রুত খরচ ছাঁটাই ও ডাউন-সাইজিং-এর লক্ষ্যে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে, অন্যদিকে তারই ফলস্বরূপ এক ধাক্কায় কাজ হারায় হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ সাধারণ শ্রমিক কর্মচারী। বেতন সংকোচন ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা ছাঁটাই-এর শিকার হয় আরও বহু মানুষ। বেকারি ও দারিদ্রের হাহাকার নেমে আসে সারা দেশজুড়ে। স্বপ্নরাজ্যের সেই রূপকথা এক ধাক্কায় রাতারাতি ভেঙে পড়ে খান খান হয়ে।

ওয়ার্কার্স ওয়ার্ল্ড পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সাম্প্রতিক প্রবন্ধে ফ্রেড গোল্ডস্টাইন এ সম্পর্কে যে তথ্য পেশ করেছেন তাতে দেখা যাচ্ছে, আমেরিকায় আজ বেকারের সংখ্যা সরকারি ভাবেই ১ কোটি ৪৫ লক্ষ — অর্থাৎ দেশের মোট কর্মক্ষম জনসংখ্যার ৯.৪ শতাংশ। তার মানে, এককে জন উপার্জনশীল মানুষের উপর গড়ে পরিবারের আরও ৩ জন নির্ভরশীল ধরলে বেকারি সমস্যায় জর্জরিত মানুষের সংখ্যাটা দাঁড়াবে প্রায় ৬ কোটি। এদের মধ্যে অর্ধেক মানুষও আজ ওদেশে সামাজিক সুরক্ষার উদ্দেশ্যে গঠিত বিভিন্ন প্রকল্প, অর্থাৎ বেকারভাতা বা ঐ ধরনের অন্যান্য সুযোগসুবিধা পাচ্ছেন না। এরা ছাড়াও আছে আরও এক বিশাল সংখ্যক মানুষ, যাদের হাতে পূর্ণ সময়ের কোনও কাজ নেই। অর্থাৎ নানা সাময়িক বা আংশিক সময়ের কাজ করে কায়ক্লেশে ও তীব্র অনিশ্চয়তার মধ্যে এদের জীবনধারণ করতে হয়। এদের সংখ্যাটাও নেহাৎ হেলাফেলা করার মতো নয় — প্রায় ২ কোটি ৫০ লক্ষ, মানে ওদেশের কর্মক্ষম জনসংখ্যার প্রায় ১৬.৪ শতাংশ। শুধুমাত্র নিউ ইয়র্ক শহরেই বেকারের সংখ্যা বর্তমানে ১০ লক্ষ ছাপিয়ে গেছে। সারা বিশ্বেই মোটরগাড়ি শিল্পের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ডেট্রয়েটেও আজ কর্মরত মানুষের তুলনায় কর্মহীন মানুষের সংখ্যাই বেশি। এই হল আজ সারা পৃথিবীর উপর আধিপত্যকামী উদ্ধত সাম্রাজ্যবাদী দেশ আমেরিকার আভ্যন্তরীণ চিত্র।

অথচ বুর্জোয়া প্রচারমাধ্যমের পাতায় চোখ রাখুন। দেখবেন অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও নতুন করে উন্নয়নের এক মনমোহিনী চিত্র। দেউলিয়া হতে বসা আর্থিক সংস্থা ও ব্যাঙ্কগুলিকে ফের নিজের পায়ে দাঁড় করাতে মার্কিন সরকার তাদের জন্য যে অর্থনৈতিক প্যাকেজ ঘোষণা করেছে, টাকার অঙ্কে তার সংখ্যাটা সত্যিই চোখ কপালে তুলে দেওয়ারই মত — ৮ ট্রিলিয়ন ডলার, মানে প্রায় ৪ কোটি কোটি টাকা। কিন্তু দেশের সাধারণ মানুষকে তাদের এই দুরবস্থায় সরাসরি সাহায্য না করে হঠাৎ এইভাবে ব্যাঙ্ক ও আর্থিক সংস্থাগুলিকে এই বিপুল পরিমাণ সাহায্য করা কেন? মার্কিন সরকার তার ব্যাখ্যায় ফিরে গেছে সেই পুরনো চুঁইয়ে পড়া অর্থনীতির ভাষ্যে — অর্থাৎ ব্যাঙ্কগুলিকে দেওয়া এই বিপুল পরিমাণ অর্থসাহায্য শেষপর্যন্ত চুঁইয়ে চুঁইয়ে নাকি সাধারণ মানুষের কাছেই নেমে আসবে। কিন্তু এই যুক্তি যে আসলে পুরোটাই ভাঁওতা তা ধরা পড়ে যায় অন্য কয়েকটি তথ্য থেকে। অর্থনৈতিক এই তথাকথিত অগ্রগতির প্রক্রিয়ায় সত্যিকারের নতুন কাজ সৃষ্টির কোনও প্রস্তাবই নেই। যা রয়েছে তা হল শুধু কিছু প্রফেশনাল ট্রেনিং দেওয়ার প্রস্তাব। পাঠক মিলিয়ে নিন, সিঙ্গুরেও টাটাদের কারখানা তৈরি করতে জমি হারানো অসহায় কৃষকদের বিক্ষোভ সামাল দিতে এই ধরনেরই কিছু প্রফেশনাল ট্রেনিং-এরই খুড়োর কল সামনে ধরা হয়েছিল, কোনও প্রকৃত চাকরির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়নি। আর সেইসাথে যা আজ ওদেশের শ্রমিক কর্মচারীদের সামনে সবচেয়ে বড় বিপদ, কাজের অনিশ্চয়তার খাঁড়া, তা প্রশমনেও বিন্দুমাত্র কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। যেকোনও চালু কারখানা লোকসানের অজুহাতে রাতারাতি বন্ধ করে দেওয়া, যার ফলে এক ধাক্কায় বেকার হয়ে পড়তে বাধ্য হয় সেই কারখানার সমস্ত শ্রমিক কর্মচারী, তা আজ আমেরিকার মানুষের নিত্য অভিজ্ঞতা। অথচ এতবড় অর্থনৈতিক ধসের পরেও আমেরিকায় এভাবে কারখানা হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া কোনও অপরাধ নয়। এই মর্মে কোনও প্রস্তাবও নেওয়া হয়নি।

আসলে যা বোঝার, তা হল পুঁজিবাদী অর্থনীতির চেহারাটা সারা পৃথিবীতেই এক। এখানে সবকিছুই চলে সর্বোচ্চ মুনাফার উদ্দেশ্যে, একচেটিয়া পুঁজিপতিদের স্বার্থে। সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ, মধ্যবিত্ত, গরিব, শ্রমিক-কর্মচারী — তাদের অভাব, দারিদ্র, দুর্দশা এখানে আদৌ বিবেচ্যই নয়। একমাত্র যা বিবেচ্য তা হল সবচেয়ে বেশি মুনাফা। এই হল পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত মূল নিয়ম। পৃথিবীর দেশে দেশে আমরা আজ যা দেখতে পাচ্ছি, তা আসলে সেই দেশের বিশেষ পরিস্থিতি অনুযায়ী এই নিয়মেরই বিশেষ বহিঃপ্রকাশ। আমেরিকার ক্ষেত্রেও বিষয়টা তাই। পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদদের মতে বর্তমানে ক্রমাগত কর্মসংকোচন করে যাওয়াই নাকি সেদেশের অর্থনীতির পক্ষে ভাল। কারণ তাতে করে যদি অনিশ্চয়তার বাতাবরণটা বজায় রেখে অন্তত ১০ শতাংশ মানুষকে সবসময় বেকার রাখা সম্ভব হয়, তবে ক্রমাগত ছাঁটাই-এর ভয় দেখিয়ে শ্রমিক-কর্মচারীদের কম বেতনে খাটতে বাধ্য করে আরও বেশি মুনাফা অর্জন করা সম্ভব হবে। বাস্তবে এখন ওদেশে অবস্থাটাই দাঁড়িয়েছে কারখানা চালু রাখার চেয়ে বন্ধ করে দিলেই মালিকের লাভ বেশি। কারণ তাতে তার শ্রমিক কর্মচারীদের বেতন বাবদ প্রদেয় টাকা বেঁচে যাবে। সেই টাকা ফাটকা হিসেবে বিনিয়োগ করে হয়তো আরও বেশি লাভ আসবে। তাতে শ্রমিক কর্মচারীরা মরল কি বাঁচল তাতে কী এল গেল।

আসলে পুঁজিবাদের এই সংকট আজ বিশ্ব জুড়েই। আমেরিকারই ডিপার্টমেন্ট অফ ইকনমিক অ্যান্ড সোস্যাল অ্যাফেয়ারস'-এর ফেব্রুয়ারি ২০০৭-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, সারা পৃথিবীতে আজ বেকারের সংখ্যা ১৬০ কোটি — অর্থাৎ সারা পৃথিবীর কর্মক্ষম জনসংখ্যার প্রায় এক তৃতীয়াংশ। আমেরিকায় ক্রমবর্ধমান বেকারিও এর থেকে আলাদা কিছু নয়। পুঁজিবাদে এই সংকট থেকে মুক্তির বাস্তবে কোনও উপায়ই নেই। যা করা হচ্ছে, তা আসলে একটু আধটু তাপ্পি মেরে সেই পুরনো নড়বড়ে মেশিনটাকেই কোনওরকমে চালু রাখা। এই পরিস্থিতিই সারা বিশ্বে মানুষকে বিকল্প খুঁজতে সাহায্য করবে।

পিটিটিআই ছাত্রছাত্রীদের নিয়োগে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে না — মন্ত্রীর ঘোষণার প্রতিবাদে এ আই ডি এস ও

২৯ জুন বিধানসভায় শিক্ষামন্ত্রী পার্থ দে ঘোষণা করেছেন, প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে পিটিটিআই ছাত্রছাত্রীদের কোনওরকম সুযোগ দেওয়া হবে না। তাঁরা নন-ট্রেন্ডদের নিয়োগ করবেন। বাস্তবে এর মধ্যে দিয়ে তাঁরা নিজেদের দলের অনুগত কর্মীদেরই চাকরি দেবেন। ঐ দিন এক বিবৃতিতে এই ঘোষণার তীব্র বিরোধিতা করেছেন এ আই ডি এস ও রাজ্য সম্পাদক কমরেড কমল সাঁই।

ইতিমধ্যেই ১১জন পিটিটিআই ছাত্র আত্মহত্যা করেছেন। সরকারের এই ঘোষণায় আত্মহত্যাকারী ছাত্রের সংখ্যা আরও বাড়বে বলেই আশংকা।

এ আই ডি এস ও-র পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, নিয়োগের ক্ষেত্রে পিটিটিআই ছাত্রছাত্রীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে, পিটিটিআই সমস্যার সমাধান করে ডিগ্রির বৈধতা দিতে হবে, আত্মহত্যাকারী ছাত্রদের পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কমল সাঁই জানিয়েছেন, দাবিগুলি পূরণ করা না হলে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী বিধানসভা অভিযান করবে।

অ্যাবেকার কোতুলপুর শাখা সম্মেলন

বাঁকুড়া জেলার কোতুলপুরে ২০ জুন অ্যাবেকার স্থানীয় শাখার দ্বিতীয় সম্মেলনে শতাধিক বিদ্যুৎ গ্রাহক উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন প্রবীর ভক্ত। বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক স্বপন নাগ, সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য প্রদ্যুৎ চৌধুরী প্রমুখ। তারাপদ দে-কে সভাপতি, তারাপদ গরাইকে সম্পাদক করে ২০ জনের কমিটি গঠিত হয়েছে।

বীরভূম

ভর্তির দাবিতে ডি আই দপ্তরে ছাত্র বিক্ষোভ

মাধ্যমিকে পাশের হার বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও সেই অনুপাতে স্কুলগুলিতে আসনসংখ্যা বৃদ্ধি না হওয়ায় অন্যান্য জেলার মতো বীরভূমের ছাত্রছাত্রীরাও ভর্তি সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। এই সুযোগে বিভিন্ন স্কুল কর্তৃপক্ষ অস্বাভাবিক হারে ফি বৃদ্ধি ঘটাচ্ছে।

এর প্রতিবাদে ৩ জুন ডি এস ও জেলা সম্পাদিকা কমরেড যুথিকা ধীবরের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল ডি আইকে স্মারকলিপি দেয়। ডি আই ভর্তি সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেন।

এছাড়া সরকার নির্ধারিত ফি-র বেশি নেওয়ার প্রতিবাদে জেলার ময়ূরেশ্বরে উচ্চবিদ্যালয়ে ১৬ জুন এবং সিউড়ির রামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠ ও চন্দ্রগতি উচ্চবিদ্যালয়ে এবং রামপুরহাট জে এল বিদ্যালয় ও রামপুরহাট হাইস্কুলে যথাক্রমে ১৫ ও ১৭ জুন ডেপুটেশন দেওয়া হয়। প্রতিটি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকেরা অধিক সংখ্যক ছাত্রভর্তির প্রতিশ্রুতি দেন।

মহাকরণ সংগ্রাম কমিটির গণঅবস্থান

পর্যটন বিভাগে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির এক নেতার বেআইনি পদোন্নতি বাতিল, পর্যটন বিভাগে বেরকারিকরণ রদ, মৃত কর্মচারীর পোষ্যের নিঃশর্ত চাকরি, শূন্যপদ পূরণ ইত্যাদি দাবিতে ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট স্ট্রাগলিং এমপ্লয়ীজ ইউনিটি ফোরাম সহ আটটি সংগঠনের যৌথ মঞ্চ মহাকরণ সংগ্রাম কমিটির ডাকে ১৮ জুন ৩/২ বি বা দী বাগ অফিসে সারাদিনব্যাপী গণঅবস্থান কর্মসূচি পালিত হয়।

উল্লেখ্য, মহাকরণ সংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে ১১ জুন উচ্চশিক্ষা দপ্তরের শাখা রাজ্য লেখ্যাগার (স্টেট আর্কাইভ্স)-কে ডাইরেক্টরেট করে দেওয়ার প্রতিবাদে মহাকরণে বিশাল মিছিল ও ১৫ জুন কেয়ার-টেকিং কর্মচারী পদের প্রায় ৩০ শতাংশ শূন্যপদ পূরণ সহ বিভিন্ন দাবিতে পূর্ত দপ্তরে গণডেপুটেশন দেওয়া হয়। কর্মচারীদের দাবি দাওয়া নিয়ে যুক্তমঞ্চ ধারাবাহিক আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে।

গোসাবার মানুষের দুর্গতি সীমাহীন

চারের পাতার পর

'প্রায় শ' দেড়েক টিউবওয়েল হলে যেখানে গোসাবা ব্লকের পানীয় জলের সমস্যার মোকাবিলা করা সম্ভব, সেখানে মাত্র ২৫টি মঞ্জুর করেছে প্রশাসন। সেগুলির মধ্যে এ পর্যন্ত মাত্র ৪টি বসানো হয়েছে। টিউবওয়েল বসানোর জন্য একটি মাত্র টীমকে কাজে লাগানো হয়েছে। ফলে, মঞ্জুর হওয়া টিউবওয়েলগুলোই বসাতে কত কাল যে লাগবে — তার ইয়ত্তা নেই।' বললেন, 'মানুষকে নিয়ে এরা কেউ ভাবছে না। সরকারি ডাক্তাররা পঞ্চায়েত অফিসে এসে ঘন্টা দুই বসে চলে যাচ্ছেন। মানুষ বিপদের সময় তাঁদের পাচ্ছে কতটুকু? অধিকাংশ মানুষকেই নির্ভর করতে হচ্ছে গ্রামীণ ডাক্তারদের উপর।

নদীবাঁধ খাড়া করতে প্রশাসনের গড়িমসি

কুমিরমারির মাঝেরপাড়ায় ২০ জুন শনিবার প্রায় ১০০ জনের মতো গ্রামবাসী নদীবাঁধের প্রায় আধ কিলোমিটার বিধ্বস্ত অংশটি যে কোনও মূল্যে খাড়া করতে চেষ্টা করছিল। পরবর্তী কোটালে জোয়ারের জল যাতে এলাকায় ঢুকতে না পারে!

বাঁধ নির্মাণ এত দেরিতে কেন? স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য বললেন, 'কয়েকজন কন্ট্রাক্টর কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েও আসেনি। তাই মাত্র এক সপ্তাহ আগেই বাঁধের কাজ শুরু হয়েছে। এলাকায় পুরুষ কম। মহিলা ও শিশুরা কাজে সাহায্য করছে। কিন্তু মাটি কাটার মেসিন না হলে এখানে কাজ শেষ করা কঠিন। নতুন কন্ট্রাক্টর এক সপ্তাহ আগে এই মেসিন আনার প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলে গেছে।'

সরকার ও প্রশাসনের যেমন গয়ংগচ্ছ ভাব, কন্ট্রাক্টরেরও তেমনই। এলাকার মানুষগুলোকে নিয়ে কারও কোনও উদ্বেগ নেই। কারণ, সরকার জানে — তারা যাই করুক না কেন, জনগণের ট্যাক্সের টাকা সরকারের ভাণ্ডারে ঠিক পৌঁছে যাবে; কন্ট্রাক্টররা জানেন — তাঁদের প্রাপ্য টাকা সরকারের থেকে পেয়ে যাবেনই; প্রশাসনের কর্তারাও জানেন — মাসান্তে বেতন ঠিক পেয়ে যাবেন। এই সমস্ত টাকাই কিন্তু জনগণের। তবু সেই জনগণই সবকিছু থেকে বঞ্চিত। জনগণ অনাহারে-অর্ধাহারে-অসুখে ভোগে, কাঁদে, মরে। আর, ওঁরা বহাল তবিয়তে চলেন, ওঁদের সম্পদ ক্রমাগত বেড়েই চলে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কী অপূর্ব মহিমা! মানুষ সংঘবদ্ধভাবে প্রতিবাদে সোচ্চার না হলে রেহাই নেই। গোসাবার মানুষ সেটা বুঝেছেন বলেই গড়ে তুলেছেন 'আয়লা বিধ্বস্ত জনগণের কমিটি'। এলাকায় এলাকায় এই কমিটির শাখা গড়ে তুলে আন্দোলন সংগঠিত করার উপর মানুষের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

R. No 5268 / 60
Postal Registration No. SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2007-09
P. R.(Fgn) No. SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/FGN - 028/2007-09

লালগড়-গোয়ালতোড়-বিনপুরের চৌহদ্দি ছাড়িয়ে

বাঁকুড়া জেলায় আধাসেনার তাণ্ডব

শান্তি প্রতিষ্ঠার কথা বলে প্রেরিত কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী বাঁকুড়া জেলায় চরম অশান্তি ও অরাজকতার পরিবেশ তৈরি করছে। গত ১৮ জুন সারেঙ্গা বাজার দিয়ে 'সন্ত্রাসবিরোধী জনগণের কমিটি'র একটি মিছিল যাচ্ছিল, যাতে অধিকাংশই ছিলেন গ্রামের কৃষক-খেতমজুর ঘরের মহিলারা, সেনারা অতর্কিতে সেই মিছিলে আক্রমণ চালায়। লাঠির ঘায়ে যাঁরা লুটিয়ে পড়েছিলেন, রাস্তার উপরেই তাঁদের যেভাবে প্রহার করা হয়, তাতে প্রত্যক্ষদর্শী সকলেই বলেছেন, সেনাদের হিংস্রতা পশুকেও হার মানিয়েছে। লাঠির নির্মম ঘায়ে বহু মহিলা জ্ঞান হারান। ঐ অবস্থাতেই তাঁদের পুলিস ভ্যানে তুলে জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। শুধু মিছিলের মহিলারাই নন, পথচারীরাও অত্যাচার থেকে রেহাই পাননি। খয়েরপাহাড়ির শেফালি মাহালি সারেঙ্গায় এসেছিলেন ডাক্তার দেখাতে। তাঁকেও 'মাওবাদী' তকমা দিয়ে জেলে ভরে দেওয়া হয়েছে। সুজিত রজক সারেঙ্গায় নিজের শ্বশুরালয় থেকে ফিরছিলেন, তাঁরও ঠাঁই হয়েছে জেলে। অসুস্থতার জন্য সেদিনই তিনি যে ডাক্তারকে দেখিয়েছিলেন, তাঁর প্রেসক্রিপশন দেখানো সত্ত্বেও পুলিস তাঁকে ছাড়েনি। 'মাওবাদী' বলে অভিযুক্ত হওয়ায় তিনি জামিনও পাননি। 'সংবাদ' কাগজের সাংবাদিক সুশীল মাহালিকেও সেনারা লাঠিপেটা করেছে। ২৬ জুনের সংবাদপত্রে লিখেছে, ১৮ জুন মহিলাদের সঙ্গে গ্রেপ্তার হওয়া তিন নাবালিকা লক্ষ্মীমণি মুর্মু (১৪), শেফালি মুর্মু (১৩), সজনি মান্ডি (১১)-দের এখনও খোঁজ মেলেনি। কোতুলপুর থানার রানাহাট গ্রামের গৃহবধূ পূর্ণিমা গরাইকে মধ্যরাত্রে বাড়ি থেকে তুলে এনে জেলে ভরে দেওয়া হয়েছে। গ্রামবাসীরা বিস্ময়ে হতবাক। পূর্ণিমা গরাই নিরীহ গ্রামীণ মহিলা, গ্রামের কেউই কখনও তাঁকে কোনও রাজনৈতিক সভা-সমিতিতে দেখেনি। সারেঙ্গায় তাঁর পিত্রালয় — এটাই তাঁর অপরাধ। এই অত্যাচারিত বন্দি মহিলাদের মধ্যে পরিচিত দু-তিনজনের সঙ্গে ২২ জুন এস ইউ সি আই সারেঙ্গা ইউনিট ইনচার্জ কমরেড সুষমা মাহাত কিছু বিস্কুট নিয়ে দেখা করতে যান। ফলস্বরূপ, ঐদিন রাত ১০টা পর্যন্ত পুলিস কর্তাদের সাদর আপ্যায়নের ঘেরাটোপে তাঁকে কাটাতে হয়।

গ্রামে গ্রামে মারধর ও গ্রেপ্তারি চলছেই। সারেঙ্গা ব্লকের বিভিন্ন গ্রামের সন্ত্রস্ত মানুষজন ঘরবাড়ি ছেড়ে পালাচ্ছেন। এঁদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। সারেঙ্গা থেকে পালিয়ে আসা বহু মানুষকে রানিবাঁধ, খাতরা, ছাতনা ইত্যাদি স্থানে আত্মীয়বাড়িতে দেখা যাচ্ছে। এলাকায় একটা আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

কিন্তু পুলিস প্রশাসনের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ প্রতিবাদেও নামছেন। শিল্পী-সাংস্কৃতিক কর্মী-বুদ্ধিজীবী মঞ্চ প্রচারপত্র নিয়ে রাস্তায় নেমেছে, প্রতিবাদসভা করছে। ২৬ জুন বাঁকুড়া শহরের বুদ্ধিজীবীরা প্রতিবাদ মিছিল সংগঠিত করেছেন। অন্যদিকে এস ইউ সি আই বাঁকুড়া জেলা কমিটির উদ্যোগেও লালগড় সহ বিভিন্ন এলাকায় সামরিক বাহিনীর অভিযান ও অত্যাচার বন্ধের দাবিতে প্রতিবাদসভা সংগঠিত হচ্ছে। এই দাবি ও তার সঙ্গে ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন, মূল্যবৃদ্ধি রোধ ও পিটিটিআই সমস্যা সমাধানের দাবিতে ৩০ জুন বাঁকুড়া শহরে এস ইউ সি আই-এর উদ্যোগে গণঅবস্থান ও ধর্না সংগঠিত হয়েছে।

লালগড়ে যৌথ অভিযান বন্ধ, মূল্যবৃদ্ধি রোধ, লোডশেডিং বন্ধ ইত্যাদি দাবিতে রাজ্যপালের কাছে এস ইউ সি আই-এর প্রতিনিধি দল

লালগড়ে আধাসামরিক বাহিনীর আক্রমণ, পুলিশি জুলুম ও সন্ত্রাস বন্ধ করা, জনসাধারণের কমিটির দাবিগুলি কার্যকর করা, আয়লা দুর্গতদের ত্রাণের ব্যবস্থা করা, মূল্যবৃদ্ধি রোধ, লোডশেডিং বন্ধ করা, পিটিটিআই সমস্যার দ্রুত সমাধান করার দাবিতে ২৬ জুন এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে রাজ্যপালের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। কমরেড দেবপ্রসাদ সরকারের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলে ছিলেন কমরেড গোপাল কুণ্ডু, কমরেড সঞ্জিত বিশ্বাস ও কমরেড কার্তিক সাহা। প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে রাজ্যপালকে একটি স্মারকলিপি দিয়ে বলা হয়, সাধারণ মানুষের সমস্যাগুলি সমাধানে রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে রাজ্যপাল উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেবেন বলে এস ইউ সি আই প্রত্যাশা করে। রাজ্যপাল বিষয়গুলি দেখবেন বলে আশ্বাস দেন।

কী উদ্দেশ্যে লালগড়ে সামরিক অভিযান

ছয়ের পাতার পর

সাহিত্যিকরা মানবিকতার স্বার্থে এগিয়ে এসেছিলেন। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার এঁদের এই ভূমিকায় উদ্বিগ্ন হয়েছিল। এবারও যাঁরা লালগড় আন্দোলনের স্বার্থে এগিয়ে এসেছেন, যাঁরা প্রশাসনকে জানিয়ে লালগড়ে গিয়েছিলেন, তাঁদেরও নানাভাবে হুমকি দেওয়া হচ্ছে, গ্রেফতারের ভয় দেখানো হচ্ছে, যাতে এঁরা ভবিষ্যতে কোনও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পাশে না দাঁড়ান।

আজ লালগড়ের হাজার হাজার আদিবাসী এবং গরিব মানুষ আক্রান্ত, বিপন্ন, অত্যাচারিত, নির্যাতিত হয়ে এলাকা ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। আর এইভাবে একটা ন্যায়সঙ্গত গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে পর্যুদস্ত করে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার 'শান্তি প্রতিষ্ঠা' করতে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গের সর্বস্তরের গণতান্ত্রিক জনসাধারণকে লালগড় ও জঙ্গলমহলের এই বিপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে। দাবি তুলতে হবে, পুলিস ও আধা সামরিক বাহিনীর অভিযান বন্ধ কর, ধৃত সকল বন্দীদের মুক্তি দাও, জনসাধারণের কমিটির সঙ্গে আলোচনা করে তাদের দাবিগুলি গ্রহণ ও কার্যকরী কর।

সিপিএম ইতিপূর্বে ফ্যাসিবাদী কায়দায় সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে আন্দোলন দমন করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে। কারণ সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের সংগ্রামী জনগণের পাশে গোটা রাজ্যের জনগণ বলিষ্ঠভাবে দাঁড়িয়েছিল। আজও তেমনি লালগড়ের এই গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পাশে সকলকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞভাবে দাঁড়াতে হবে। সিঙ্গুর নন্দীগ্রামের আন্দোলন প্রমাণ করেছে জনগণের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ শক্তি রাষ্ট্র ও সরকারের সামরিক ও পুলিশ বাহিনীর চেয়েও অনেক বেশি শক্তিশালী। আগামী দিনেও লালগড়ের গণআন্দোলন তা পুনরায় প্রমাণ করবে। অত্যাচার, দমন-পীড়ন শেষ পর্যন্ত কোথাও জয়লাভ করে না, জয়লাভ করে উন্নত আদর্শ ও নৈতিক বলে বলীয়ান সুসংগঠিত ন্যায়সঙ্গত গণআন্দোলন।

আসাম

শিলচর-লামডিং ব্রডগেজ রূপায়ণের দাবিতে সফল আন্দোলন

গণকনভেনশনে বক্তব্য রাখছেন পশ্চিমবঙ্গের এস ইউ সি আই সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল

আসামের বরাক উপত্যকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক কর্মীর ডাকে এক বিশাল গণকনভেনশন অনুষ্ঠিত হয় ২১ জুন শিলচর জি সি কলেজ অডিটোরিয়ামে। দাবি ছিল উপযুক্ত নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করে শিলচর-লামডিং ব্রডগেজের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা, পর্যাপ্ত নিরাপত্তা দিয়ে মিটার গেজে যাত্রী রেল পরিষেবা চালু করা এবং রেল পরিষেবা পুনরায় চালু না হওয়া পর্যন্ত ভর্তুকি দিয়ে রেল ভাড়ার সমহারে সরকারি বাস পরিষেবা চালু করা। মিজোরাম, মণিপুর ও ত্রিপুরার প্রতিনিধিরাও আমন্ত্রিত ছিলেন কনভেনশনে। এছাড়াও আমন্ত্রিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের এস ইউ সি আই সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল। দুটি বিশাল মিছিল কনভেনশন স্থলে মিলিত হয়। কনভেনশনের সভাপতিমণ্ডলীতে ছিলেন বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিক বিজিৎ কুমার ভট্টাচার্য, সাহিত্যিক প্রসূন কান্তি দেব, বিশিষ্ট শিক্ষক শ্যামদেও কুর্মী, কিরণ শঙ্কর নাথ। আমন্ত্রিত বক্তা ছিলেন আসামের গণআন্দোলনের অন্যতম নেতা কান্তিময় দেব, বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও গল্পকার শ্যামলেন্দু চক্রবর্তী, ইতিহাসবিদ অধ্যাপক কামালউদ্দিন আহমেদ, অধ্যক্ষ তাপস শঙ্কর দত্ত, মিজোরামের প্রতিনিধি সি লালনানপুইয়া। ডাঃ মণ্ডল বলেন, তিনি রেলমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে কথা বলবেন, সংসদেও বিষয়টি উত্থাপন করবেন। গণকনভেনশন থেকে অজয় রায়, অরুণাংশু ভট্টাচার্য ও সুশীল পালকে আহ্বায়ক মনোনীত করে এবং ৩৫ জন কার্যকরী সদস্যকে নিয়ে গণসংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়। উল্লেখ্য, গণআন্দোলনের চাপে সরকার এবং রেল কর্তৃপক্ষ ২৫ জুন থেকে শিলচর-লামডিং মিটার গেজে এক যাত্রী রেল চালু করেছে।

শোষণের নতুন নাম এস ই জেড

পাঁচের পাতার পর

আছে, এস ই জেডগুলির জন্য তার থেকে ভিন্ন আইনের ব্যবস্থা করার দ্বারা সংবিধানে উল্লিখিত সমতার মৌলিক অধিকারটিকেও লংঘন করা হচ্ছে না কি?

সঙ্কুচিত বিশ্ব পুঁজিবাদী বাজারে, মুনাফার ভাণ্ডার বাড়িয়ে যেতে চূড়ান্ত শ্রমিক শোষণের দ্বারা উদ্বৃত্ত মূল্যের হার বৃদ্ধির নয়া উপায় হিসাবেই দুনিয়ার একচেটিয়া পুঁজিপতিরা এস ই জেড-এর পরিকল্পনা এনেছে। নয়া পুঁজিবাদী চীন এ ব্যাপারে পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। এই এস ই জেড-কেই উন্নয়নের নতুন মডেল হিসাবে দেখাবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে ক্ষমতালোভী পুঁজিবাদী ও বামপন্থার ভেকধারী সোস্যাল ডেমোক্রেটিক রাজনৈতিক দলগুলি। পুঁজিপতিদের দয়ায় গদি টিকিয়ে রাখার চেষ্টায় তাদের নানা অন্যায্য সুযোগ সুবিধা পাইয়ে দিতে মরীয়া এই দলগুলির খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক এবং কৃষিমজুরদের ওপর নির্মম অত্যাচার ও দমন পীড়ন চালাতে দ্বিধা নেই। শ্রেণীশোষণকে তীব্রতর করে পুঁজিপতিশ্রেণীর মুনাফার থলি আরও ভরিয়ে তোলার এই কাজে বিজেপি, কংগ্রেসের মতো দক্ষিণপন্থী বুর্জোয়া দলগুলির পাশাপাশি সিপিএম, সিপিআই-এর মতো 'বাম' নামধারী দলগুলিও সমান দড়। পার্টির কাগজপত্রে এস ই জেড বিরোধী লেখা লিখতে লিখতে এবং মুখে বিরুদ্ধাচরণের বড় বড় কথা বলতে বলতে এই 'বামপন্থী' নামধারীরাই ২০০৩ সালে, অন্য সমস্ত রাজ্যে চালু হওয়ার আগে সর্বপ্রথম পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় এস ই জেড আইন পাশ করেছে।

সিঙ্গুর, বিশেষত নন্দীগ্রামের এস ই জেড বিরোধী আন্দোলন এই শিক্ষাই দিয়ে গেছে যে, সরকারকে এই পুঁজিপতি তোষণকারী জনস্বার্থবিরোধী এস ই জেড গঠনের নীতি থেকে সরে আসতে বাধ্য করতে হলে সঠিক রাজনৈতিক নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলনকেই একমাত্র হাতিয়ার করতে হবে। নন্দীগ্রাম আন্দোলনই গোটা দেশে এস ই জেড বিরোধী গণআন্দোলনগুলির প্রেরণা হিসাবে কাজ করে বহু জায়গায় সরকারকে জনমতের কাছে নতি স্বীকারে বাধ্য করছে। মুকেশ আম্বানির মুম্বাই এস ই জেড বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঘটনা এ কথার সত্যতাই প্রমাণ করে। তাই নতুন করে এস ই জেড গঠনের পরিকল্পনা নেওয়ার আগে দ্বিতীয় ইউ পি এ সরকারের বোঝা দরকার যে, নন্দীগ্রাম আন্দোলনের গৌরবময় ভূমিকায় উদ্বুদ্ধ সাধারণ মানুষ বিনা বাধায় পুঁজিপতিশ্রেণীকে পথ ছেড়ে দেবে না। এস ই জেডের বিরুদ্ধে তারা ঐক্যবদ্ধ মরণপণ লড়াই গড়ে তুলবে এবং তাদের সমর্থনে এগিয়ে আসবে গোটা দেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২২৭১৯৫৪, ২২২৬০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৪-৫১১৪, ২২২৭-৬২৫৯ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.suci.in